ভাঙাগড়া

শ্রীকুমারেশ ঘোষ



রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা, ৬

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৫৪

প্রচ্ছদপট

শ্রীঅন্নদা মুন্সী

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬, থেকে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র এম. এ. প্রকাশ করেছেন, আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ হাজরা ছেপেছেন।

আজকালকার ভাঙাগড়ার দিনে
যাঁরা
যা কিছু খারাপ তা' ভেঙে দিয়ে
ভালো কিছু গড়বার জন্যে ব্যস্ত
তাঁদেরই হাতে
তুলে দিলাম এই উপন্যাসখানি
"ভাঙাগড়া"

আমার জানানো উচিত

উপন্যাসখানি প্রথমে লিখেছিলাম ১৯৩৯ সালে ; তখন এটি ছিলো বিশুদ্ধ প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রেমের ছড়াছড়ি দেখে আমি তাড়াতাড়ি আমার এই প্রেমের উপন্যাসখানি লুকিয়ে ফেলি। সে সেই যুদ্ধ-পূর্ব-দিনের কথা।

তারপর যুদ্ধোত্তর দিনে—যখন আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেছে—একদিন আমি নিভৃতে প'ড়ে শোনালাম আমার প্রেমের উপন্যাস আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগদিন্দু বাগচীকে। বন্ধুবর শুনে—লজ্জা-করে-বলতে এমন সব প্রশংসা ক'রে বললেন: 'আমরা এখন অনেক বদলে গেছি। তাই আসল গল্প না বদলে বরং বাৎলে দিন আমাদের আধুনিক সমস্যার সমাধান। এটাই বিশেষ জরুরী এখন—প্রেম নয়।'

বেশ! তাই হোক্। যুদ্ধের ভাঙাগড়ার দিনে—বেয়োনেটের খোঁচায় এবং বন্ধুর ইঙ্গিতে আমার প্রেমোপাখ্যান রূপান্তরিত হ'লো—আধুনিক সমস্যামূলক সামাজিক উপন্যাসে।

অমিয়র 'শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানে' দেখানো হয়েছে বাঙালীর জন্যে কত রকমের স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রয়েছে খোলা। শুধু 'মানের' গোড়ায় ছাই ঢালতে পারলেই হয়। আর, আভার বিয়ের মতো অনাড়ম্বর বিয়ে যদি আমাদেব সমাজে চলতি হয়—তবে অনেক মেয়ের বাবা-ই নিঃশ্বাস ছেড়ে বাচবেন। বিয়েতে না-খাওয়ানোর লজ্জা তো ভেঙে দিয়েছেন আমাদের সরকার—এই রেশনের যুগে। আর বাধা কী?

'সোনার বাঙলা' আবৃত্তি-অভিনয়টি লিখেছিলাম আমাদের 'অবসর-আসরের' প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে অভিনয়ের জন্যে। এটি অভিনয় করা এতই সহজ যে সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে যাত্রা-অভিনয়ের মতো যখন-তখন, যেখানে-সেখানে অভিনয় ক'রে—আমাদের দেশের যুদ্ধকালীন অবস্থা সহজে সবাইকে বোঝাতে পারে। ভিখারিণীর পাঠ-অংশটি একটানা একটি করুণ সুরে গাইতে পারলে সহজেই শ্রোতাদের মন ভিজিয়ে দিতে পারবে।

শেষ করবার আগে যাঁর উৎসাহে এই বইখানাকে আবার নতুন ক'রে লিখতে উৎসাহ পেয়েছিলাম—সেই সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জগদিন্দু বাগচীকে—এক-কথায় 'জবা'কে এবং যাঁর উৎসাহে বইখানি পাঠক মহলে প্রকাশ পেলো, মানে, যিনি আমাকে লুকিয়ে থাকতে দিলেন না—সেই হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মিত্রকে—এক-কথায় 'সৌ-মিত্র'কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—আমার জানানো উচিত।

৪৫ এ, গড়পার রোড, কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৫৪



শ্রীকুমারেশ ঘোষ

ভাঙাগড়া

আচ্ছা অমিয়দা',

তুমি কী ভেবেছো বলো তো ? সেই যে গেলে, আর আমাদের বাড়ীতে আসার নামটি নেই ? প্রতিদিন তোমার আসার আশায় থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হ'য়ে গেছি। না বুঝে যে অপরাধ করেছি তার কি কোনো মার্জনা নেই তোমার কাছে, অমিয়দা' ? আশা করি আস্‌বে। ইতি—

অনুভা

অমিয় চিঠিখানা পড়লো। অন্য ছেলে হয়তো এ চিঠিখানা পেলে একাধিক-বার পড়তো। পোড়ে চিঠিখানাকে অতি যত্নে ভাঁজ করে রেখে দিতো অতি গোপনীয় জায়গায়। মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া আমন্ত্রণ-লিপি, শুধু তাই নয়, একটু যেন প্রেমের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে! অতএব, এ ধরণের চিঠি পেয়ে, হয়তো সে ছেলে তক্ষুণি লেগে যেতো সাজগোজ করতে। কোঁচানো কাপড় বার হোতো; বার হোতো সিল্কের পাঞ্জাবী; জুতো-জোড়া চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌তো; এসেন্সে ভরে উঠ্‌তো ঘর; পাউডার উড়ে বেড়াতো সারা ঘরে; এবং আরো যে কী হোতো তা' কে জানে!

কিন্তু যা হোলো তা একটু আশ্চর্য রকমেরই বল্‌তে হবে। পাউ-ডারের বদলে পোড়া কাগজের ছাই অমিয়র ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগলো।

অমিয় চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলেছে। একবারমাত্র পড়েই সে বুঝতে পেরেছে চিঠিখানার মানে কী। সে চায় না ও-ধরণের চিঠি, মানে, অনুভার কাছ থেকে সে ও-ধরণের চিঠি মোটেই চায় না।

কাজেই ও--ধরণের চিঠি পেলে অন্য ছেলের মুখ আনন্দে ভরে যেতো হয়তো; কিন্তু অমিয়র সারা মুখের রেখাগুলো গেল কুঁচকে—দারুণ ঘৃণায়।

নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়ে! গায়ে-পড়া মেয়ে! কোকেট্!

অমিয় পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে, অনুভার দেওয়া চিঠির এক কোণ আগুনে ধরলো। সর্বগ্রাসী গ্রাস করতে লাগলো চিঠিখানা। সারা ঘরখানা আগুনের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত 'অনুভা' নামটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

তাই চেয়েছিলো অমিয়। অনুভার নাম পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। অনুভার স্মৃতি যাক্ মুছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে।

অমিয় পোড়া চিঠির ছাইটা দু'হাতে ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ঘরময় উড়িয়ে দিলো; অনুভাকে সে চায়না, চায় না, চায় না।

কিন্তু আশ্চর্য! কী করে এলো চিঠিখানা? ইকনমিক্সের বই খুলতে গিয়ে, ডিভিসন-অব-লেবর-এর নীরস পাতার ফাঁকে পাওয়া গেলো অনুভার অভিমান-ভরা চিঠি! অমিয় অবাক হয়ে গেলো: চিঠিটা এলো কী করে? কী করে?

উড়ে আসেনি এটা ঠিক! কিন্তু কে দিয়ে গেলো এ চিঠি? কে? তাইতো, অমিয়র হঠাৎ খেয়াল হোলো, এমনও তো হতে পারে—অনুভা নিজে এসেছিলো!

অস্বাভাবিক কিছু নয়। অমিয়র বোনের বন্ধু হিসেবে অনুভার তো অমিয়দের বাড়ীতে আসা-যাওয়া আছে। তবে কি—

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমিয় ডাক দিলো তার বোনকে, ডাক্লো:

—'আভা ! আভা !'

—'কী, দাদা ?'

আভা ছুটে এলো অমিয়র ডাক শুনে।

—'আমার টেবিল কেন অগোছালো ?' গম্ভীরস্বরে কৈফিয়ৎ তলব করলো দাদা। বোন কিন্তু স্রেফ বলে বসলো :

—'কে জানে !'

—'কে জানে মানে ?' দাদা ইকনমিক্সের বইখানা বোনকে দেখিয়ে বললো : 'এ বইখানা ছিলো বুকর‍্যাকে। টেবিলের উপর নামালে কে ?' এবং সবজান্তার সুরে গলা চড়িয়ে দাদা যখন বললো : 'নিশ্চয়ই এঘরে তবে কেউ এসেছিলো !'

তখন বোনকে বাধ্য হ'য়েই স্বীকার করতে হোলো : 'আমি আর অনু' তোমার এঘরে বসে গল্প করছিলুম।'

—'আর তোমাদের গল্প শোন্‌বার জন্যে'—অমিয় যোগ দিয়ে দিলো : 'আমার ইকনমিক্সের বই বুকর‍্যাক থেকে নেমে টেবিলে এসে বসলো।'

যদি সত্যিই বইখানা বুকর‍্যাক থেকে নেমে টেবিলে এসে বসতো, তা' হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াতো ভাবতে গিয়ে আভা হেসে ফেল্‌লো। আভার হাসি অমিয়র ভালো লাগলো না।

—'তুমি হাসতে পারো আভা, আমার কিন্তু হাসি আসছে না।' অমিয় আবার জিজ্ঞাসা করলো : 'আমি জানতে চাই বুকর‍্যাক থেকে আমার বই নামালে কে ?'

—'অনু নামিয়েছিলো !' আভা স্বীকার করলো।

—'অনুভা নামিয়েছে ? আমার বই ? কেন ?' অমিয় আবার একটু রসিকতা করলো :

—'আই-এ ক্লাসের অনুভা বুঝি সিভিক্স ছেড়ে ইকনমিক্স পড়ছে আজকাল ? তার পড়াশোনায় খুব চাড় তো !'

—'অনু বলছিলো বইখানা বেশ বাঁধানো হয়েছে ; তাই দেখছিলো।' আভা আর মিথ্যে বললো না।

—'কিন্তু বইটা আবার তুলে রাখলো না কেন তোমার বন্ধু ?' অমিয় জেরা করলো।

—'বাস্তবিক অনু ভীষণ অগোছালো,' আভা বলতে লাগলো : 'কাকীমা হঠাৎ ডাকতেই আমি নীচে চ'লে গেলুম, অনুও একটু পরে নীচে নেমে এলো, আর তোমার ঘরে আসিনি। নইলে তোমার বই, খাতা, টেবিল, সব আমি গুছিয়ে রাখতুম।' পরে নিজের প্রশংসা আদায়ের চেষ্টা করলো আভা :

—'কেন ? আমি তোমার বই গুছিয়ে রাখিনে বলতে চাও ?'

—'না, না, তা' আমি বলতে চাইনে,' অমিয় বললো : 'শুধু বলতে চাই তোমার ও অগোছালো বন্ধুকে আমার এ ঘরে না আনলে তোমার আমার দু'জনের পক্ষেই মঙ্গল। নয় কি ?'

—'বেশ তাই হবে।' আভা রাগ করলো কিনা বোঝা গেলো না। তবে সে আর দাঁড়ালো না সেখানে। অমিয় পেছন থেকে ডাকলো : 'অনুভা যে এতদিন বাদে হঠাৎ এলো ?'

—'তোমার ভয়ে আবার আমরা বাইরে যাবো কিনা জানতে।' বলেই আভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ধন্যবাদ ! অশেষ ধন্যবাদ আভাকে ! অমিয় ভাবলো—ভাগ্যিস আভা পরে তার ঘরে আর ঢোকেনি ! কী কাণ্ড !

মেয়েগুলো যেন কী ? প্রেম করা চাই,—কিন্তু প্রেমের পদ্ধতি মানবে না। প্রেমপত্র লেখা চাই—কিন্তু লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা নেই। অমিয় বেশ জানে এ পর্যন্ত যে সব প্রেমের ব্যাপার জানাজানি হয়েছে তার অধিকাংশই প্রেমপত্রের জন্যে। প্রেমপত্র হস্তান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-ঘটিত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে-বাতাসে।

কেন? অমিয়র ক্লাসফ্রেণ্ড পরেশ প্রেম করতে গিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছে ধরা প'ড়ে গেলো কী ক'রে? শেফালিকার দোষেই তো! পরেশ তো তবু শেফালিকার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলো। আর অমিয়? সে চায় না অনুভার প্রেম! সে চায় না অনুভার জন্যে তার সুনামে কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে।

তাই অমিয় নিজের মনে মনে বল্‌তে পারলো: বেশ করেছি! অনুভার চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি—ভালোই করেছি!

* * *

তা' ভালো না হয় করলো অমিয় চিঠিখানা পুড়িয়ে। একটি কুমারী মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া প্রেমের-গন্ধ-মাখানো চিঠি তার মতো এক যুবকের হাতে পড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল—এতে আর কিছু না হোক অমিয়র মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো বটে। আর দেখা গেলো এক অসংযমী মেয়ের বাঁধন-ছাড়া প্রেম (সত্যিই কি প্রেম?) সংযমের বাঁধে বাধা পেয়ে কেমন ক'রে ধূলায় ধূসর হয়।

কিন্তু কেন? কেন এমন হোলো? মেয়েরা কি এতই অসংযমী? ইকনমিক্সের বই তো আছে অনেকেরই ঘরে। বোনের বান্ধবীরা কি আসে না বাড়ীতে বেড়াতে? কৈ, তারা তো কেউ বেড়াতে এসে, প্রেম-পত্র লুকিয়ে রেখে যায় না তাদের বান্ধবীদের ভাইয়ের ইকনমিক্সের বইয়ের মধ্যে।···তবে অনুভা রাখলো কেন? কোন্ সাহসে?

এই খানেই এসে পড়ে পুরোনো কথা। বেশি পুরোনো নয়—মাত্র গত বছরের কথা। সাহস অনুভার একদিনে হয়নি,কারো তা হয় না। অমিয়কে নিয়ে প্রেমের খেলায় অনুভা একটু একটু ক'রে এগিয়ে গেছে; কোনো বাধা পায়নি অমিয়র কাছ থেকে—তাই সে আজ এতটা সাহসী হতে পেরেছে।

অমিয়র হয়তো সে সব পুরোনো দিনের কথা মনে নেই। তা' মনে না থাক্‌বারই কথা। যাকে সে সকলের থেকে আলাদা ক'রে দেখেনি

কোনোদিন, তাকে আলাদা ক'রে মনে রাখবার দরকার কী ? আর মনে থাকবেই বা কেন ?

যেমন হ'য়ে থাকে—একদিন কলেজের ছুটির পর আভা তাদের বাড়ীতে অনুভাকে নিয়ে এসেছিলো। অবশ্য ডেকে নিয়ে আস্‌বার একটা কারণ ছিলো। কারণটা হচ্ছে—আভা তার ব্লাউজে একটা নতুন ধরণের এমব্রয়ডারী করেছিলো, আর কী কথায় কথায় সে কথা গল্প করেছিলো অনুভার কাছে। সেই শুনে অনুভা ধরে বস্‌লো আভাকে—সে যেন ব্লাউজটা প'রে পরদিন কলেজে আসে, যাতে 'কাজ'টা সে দেখতে পায়। কিন্তু এমনি ভুলো মন আভার যে ব্লাউজটা প'রে কলেজে যেতে রোজই সে ভুলে যেতে লাগলো ; আর মনে পড়তে লাগলো ক্লাসে ঢুকে অনুভাকে দেখে। তিনচারদিন ঐ রকম হবার পর একদিন অভিমানিনী অনুভা বলে বসলো : 'সে ব্লাউজ যখন আজও পরে এলিনে আভা, তখন আর যদি পরিস্‌ তো আমার মাথার দিব্যি রইলো !'

—'সে কী রে ? তুই দেখবি নে সে কাজ ?' আভা থতমত খেয়ে বললো।

—'না !'

—'কেন ?'

—'নাইবা দেখলাম !'

—'না, তোকে দেখতেই হবে !' আভা ধরে বসলো : 'আজই তোকে ধরে নিয়ে যাবো আমাদের বাড়ীতে। একদিন আসবি তো বলেছিলি !'

—'না যাবো না তোদের বাড়ী।'

এবার আভার পালা। বল্‌লো : 'না যাস তো আমার মাথার দিব্যি রইলো !'

শেষ পর্যন্ত দু' বন্ধুর 'মাথার দিব্যি' কাটাকাটি হয়ে গেলো। অনুভা আভাদের বাড়ীতে যেতে রাজী হোলো শেষ পর্যন্ত এবং গেলোও।

ব্লাউজের 'কাজ'টা দেখলো অনুভা। আভার কাছ থেকে শিখেও নিলো। 'ডিজাইন'-টা নতুন ধরণের। কাজেই সেটা তুলে নিতেও ভুললো না। তারপর বন্ধুর অনুরোধে একটু মিষ্টিমুখও করতে হোলো। শেষে আভার কাকীমাকে প্রণাম করে বাড়ী যাবার সময় দেখা গেলো মহাসমস্যা! মানে, চাকরের জ্বর হয়েছে—ম্যালেরিয়া; কথা ছিলো, আভা তাদের চাকরকে সঙ্গে দেবে অনুভাকে বাড়ী পৌছে দিতে। এখন বন্ধুর যাবার সময় চাকরের খোঁজ করতে গিয়ে দেখে বেচারী সিঁড়ির তলায় এক কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে প'ড়ে শীতে 'কোঁ-কোঁ' করছে।

অনুভা ভাবনায় পড়লো : মাকে বলে আসেনি। ভেবেছিলো আভাদের বাড়ীতে আধঘণ্টা থেকেই তাদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। তাতে কতটুকু আর দেরি হবে!···অনুভা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো! সেই সঙ্গে বান্ধবী আভাও। শেষে, তার জন্যে অনুভাকে বকুনি খেতে হবে নাকি তার মা'র কাছে?

এমন সময় যেন 'ঈশ্বর-প্রেরিত' হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হোলো আভার দাদা—অমিয়। কলেজ থেকে ফিরছে সে। বগলে খাতা; সার্টের কলার ওল্টানো; হাতের আস্তিন গোটানো; কাপড়টাকে কায়দা করে মালকোঁচা মারা; পায়ে স্যাণ্ডেল; কোঁকড়ানো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালে এসে প'ড়েছে। ফর্সা মুখখানি সারাদিনের ক্লান্তিতে গেছে ভরে! শেলের কালো চশমাটা নাকের উপরে ঝুলে এসেছে খানিকটা।

অমিয়কে দেখেই আভা পরম স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌লো :

—'আঃ, আমাদের বাঁচালে, দাদা।'

—'কেন রে, মরতে যাচ্ছিলি নাকি?' বলেই খেয়াল হোলো অন্য একটি মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাই বললো তাকে : 'আপনাকে তা বলে বলিনি কিন্তু!'

অমিয়র কথা কিন্তু অনুভা ভালো করে শোনেনি। সে অমিয়র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলো এতক্ষণ। দেখছিলো তার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহখানি। দেখছিলো তার অগোছালো সাজ। বড়ো ভালো লাগছিলো অনুভার। আর আরো ভালো লাগলো অমিয়র ক্লান্ত, শ্রান্ত ভাব। আহা বেচারী! কত না ক্লান্ত-হয়ে পড়েছে!···অনুভা করুণায় গ'লে গেলো: যদি—যদি আস্তে ক'রে সরিয়ে দেওয়া যেতো কপালে লুটিয়ে-পড়া কোঁকড়ানো চুল-গুলিকে। ঐ মুখখানিকে যদি যেতো আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া!

ছিঃ! এ কিন্তু অন্যায়! দেখবামাত্র একটি ছেলের বিষয়ে অতটা ভেবে ফেলা উচিত হয়নি কিন্তু!···অনুভা নিজেকে ধমকে দিলো!

—'কৈ, উত্তর দিলেন না আমার কথার?' হকচকিয়ে গেলো অনুভা! লজ্জা পেয়ে অমিয়র মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বল্‌লো: 'কী কথা?'

অমিয় হেসে বললো: 'যাক্, বাঁচা গেলো! আমার কথা তা' হলে শুন্‌তে পান্‌নি তো?' আভা বল্‌লো: 'আমি বলছি রে, শোন্! দাদা আমাদের মর্‌তে বলছিলো।'

—'আমি তাই বলছিলাম?' কৃত্রিম রাগ দেখালো অমিয়।

—'তা' সত্যিই!' অনুভা বললো হেসে: 'ভেবে ভেবে মরছি। বাঁচানো আপনার হাতে।'

—'কেন?'

—'অনুভা বাড়ী যেতে পারছে না।' আভা বললো।

—'কেন পায়ে ব্যথা হয়েছে নাকি আপনার?' অমিয় হেসে পা দেখিয়ে বললো।

—'না, না।' অনুভার বেশ লাগলো কথাটি। হাস্‌তে হাস্‌তে বললো: 'পায়ে ব্যথা হবে কেন?

—'তবে?'

—'মানে'—রসিক ভায়ের রসিকা বোন বললো : 'বন্ধু আমার দ্বিপদ আছেন—চতুষ্পদ হ'তে চান।'

আভার কথা শুনে অনুভা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো। 'চতুষ্পদ' হওয়ার আরও একটা কী মানে হয় আভা কি তা জানে না? নেকী কোথাকার! তাই বুদ্ধিমতী অনুভা তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে দিলো : 'না, না, পদোন্নতি হয়ে জানোয়ার সাজতে চাইনে আমি! পদ আর পথ দুই-ই আমার ঠিক আছে। কেবল পথ-প্রদর্শকের অভাবে অচল হয়ে গেছি।'

—'তা, আমি কি আপনার কাছে আদর্শ পথপ্রদর্শক?'

—'ঈশ্বর-প্রেরিত যখন তখন নিশ্চয়ই।'

—'বেশ, তবে আসুন।'

অমিয় আভাকে কলেজের খাতাটা এগিয়ে দিলো : 'খাতাটা আমার ঘরে রেখে দিস্।'

বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে অমিয় চলে আস্‌ছিলো। কিন্তু অনুভা বাধা দিলো :

—'ও কি! চলে যাচ্ছেন যে?'

—'তা, আর কি করবো বলুন?'

দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে অনুভা বল্‌লো : 'বারে! আপনি চলে যান—আর মা আমাকে এত দেরি ক'রে আসতে দেখে বকুন আর কি! সেটি হবে না। দাঁড়ান, দরজা খুলুক। মাকে বলে যান আমি আপনাদের বাড়ী গেছলাম—'

কথা শেষ না হ'তেই ভেতর থেকে দরজার খিল খোলার শব্দ হোলো। পরক্ষণেই দরজা খুলে দেখা দিলেন অনুভার মা। প্রৌঢ়া—বিধবা।

—'হ্যাঁরে, তোর এত দেরি যে?' মার কথায় উৎকণ্ঠার ভাব : 'ভাবছিলাম এতক্ষণ বসে বসে।

—'গেছলাম আভাদের বাড়ীতে—ব্লাউজের একটা 'কাজ' তুল্‌তে।

শেষে আসবার লোক পাইনে—ওদের চাকরের জ্বর। ভাগ্যিস্ আভার দাদা তখন এসে পড়লেন কলেজ থেকে—কৈ আসুন ভেতরে।' অমিয়কে ডেকেই আবার নীচু গলায় বললো : 'একটু চা আর খাবার দেবে তো দাও ওঁকে। কলেজ থেকে আসতেই বাড়ীতে দাঁড়াতে দিইনি।'

অমিয় দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাই অনুভার মা এতক্ষণ দেখতে পাননি তাকে। এবার অনুভার ডাকে অমিয় দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই অনুভার মা অমায়িক হাসি হেসে ডাকলেন : 'এসো বাবা। লজ্জা কী? ভেতরে এসো। গ্যাখো তো তোমাকে আবার কষ্ট দিলো অনু।'

—'তাতে আর কী হয়েছে?' ব'লে অমিয় নীচু হ'য়ে অনুভার মাকে প্রণাম করলো।

অনুভার মা অমিয়কে ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে পাকা গিন্নীর মতোই অমিয়দের সংসারের বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতে লাগলেন। জানলেন, অমিয়র আভা ছাড়া আর ভাই বা বোন নেই। তাদের বাপ-মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন শুনে দুঃখ করলেন; সান্ত্বনাও দিলেন : বাপ-মা চিরদিন কারো থাকে না। পরে আরো জানলেন অমিয় আর আভা দুই ভাইবোন তাদের নিঃসন্তান কাকা কাকীমার কাছেই মানুষ হয়েছে।···এসব ছাড়া আরো অনেক কিছুই তাঁর জানবার ইচ্ছে ছিল : যথা, অমিয়র বাবা মারা যাবার সময় কত টাকা রেখে গেছলেন? তার মার কী-কী গয়না আছে? সে সব কার কাছে থাকে? তাদের দু'ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ চালায় কে? ইত্যাদি···। কিন্তু প্রশ্নগুলো যেমন মেয়েলী তেমনি ব্যক্তিগত। অনুভার মা তো ঐসব মেয়েলী প্রশ্ন করতেই পারতেন? কিন্তু পারলেন না, বড়ো বেশি ব্যক্তিগত ব'লে। প্রথম দিনের প্রথম আলাপেই অতটা ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করতে কেমন যেন বাধো-বাধো লাগে।

কিন্তু নিজের সংসারের অনেক কথাই তিনি কথায় কথায় ব'লে

ফেল্‌লেন। সঙ্কোচের কোন বাধাই মানবার দরকার মনে করলেন না। বল্‌লেন, তাঁর স্বামী ছিলেন, বেশ ভালো সরকারী চাকুরে। কিন্তু হ'লে হবে কী—যা' কিছু উপায় করতেন, তার বেশির ভাগ নষ্ট করতেন ঘোড়ার পিছনে—মানে, ঘোড়-দৌড়ে। অমিয়র এখনও সে কথা মনে আছে : ভদ্রমহিলা এই অর্থ-বিয়োগান্ত ব্যাপারটিকে কেমন রসিয়ে বলেছিলেন, 'উনি পকেট ভর্তি করে গড়ের মাঠে যেতেন আর আসতেন পকেট গড়ের মাঠ ক'রে।'…অমিয় কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিলো ; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছিলো—হাসাটা উচিত হয়নি ভেবে। তা' ভদ্রমহিলা অমিয়র হাসিতে কিছু মনে করেন নি নিশ্চয়ই ; নইলে ঐখানেই তাঁর গল্পে দাঁড়ি প'ড়ে যেতো। কিন্তু তা' না প'ড়ে বরং তাঁর গল্প আরো পুরোদমে চল্‌লো। বল্‌লেন : 'ঐ পোড়া ঘোড়াই আমাদের সর্বনাশ করলো। সব গয়না বাঁধা পড়লো—কিন্তু মালক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন না। বরং এতদিনের বাঁধন কেটে তিনি আমাদের ছেড়ে চ'লে গেলেন।'

অমিয়, অনুভার মায়ের মুখে ও-ভাবের সব সাংসারিক করুণ কথাগুলো শুনে কেমন যেন নিজেই লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। কোথায় এসেছিলো সে অনুভাকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে ব'লে—তা' নয়, তাকে এখন বসে বসে তাদের সংসারের সুখদুঃখের কথা শুন্‌তে হচ্ছে। অমিয় বসে বসে ঘামতে লাগলো আর অভিনয় করতে লাগলো যেন কত মন দিয়ে শুন্‌ছে। আর, অমিয়র সে অভিনয় অনুভার মাকে আরো উৎসাহিত ক'রে তুল্‌লো। ভদ্রমহিলা নতুন উদ্যমে সুরু করলেন : 'তারপর, জানো বাবা! ঐ ভাবে টাকাগুলো ক্রমাগত নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় তিনি যেন কেমন ভেঙে পড়লেন। শেষে একদিন আমার কপাল ভাঙলো! অনু তখন দশ বছরের মেয়ে।…তা' বল্‌বো কী অমিয়, এখানে থাক্‌তে তিনি যা' করতে পারেননি, স্বর্গে গিয়ে তিনি তাই করলেন। তাঁর লাইফ ইনসিওরের টাকাগুলো পেলাম ; অফিসের প্রভিডেণ্ট

ফাণ্ডের টাকাগুলোও হাতে এলো : গয়নাগুলো খালাস ক'রে আনলাম ; তবে বাড়ীটাকে বাঁচাতে পারলাম না, কারণ সুদে আসলে অনেক টাকা হয়ে গেছলো। তাই বাড়ীটাকে যে ভদ্রলোক বাঁধা রেখেছিলেন, তাঁকেই দিলাম বিক্রী ক'রে। হাতে কিছু নগদও এলো। রাখলাম পোষ্টাফিসে ক্যাশ-সার্টিফিকেট কিনে। বলো তো বাবা, ভালো করেছি কি মন্দ করেছি ?'

অচমকা এই প্রশ্নবাণে অমিয় থতমত খেয়ে বললো : 'তা—তা, এ ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও ছিলো না আপনার ?'

কিন্তু ও-ধরণের এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে ভদ্রমহিলা খুসি হলেন না। তিনি শুনতে চান—তাঁর ঐ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো। তাই স্পষ্টই বলে বস্‌লেন, :

—'কিন্তু, ব্যবস্থাটা আমার ভালো হয়েছে কিনা বল্‌লে না তো বাবা ?'

—'ভালো হয়নি আবার ? চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন !' অমিয় অনুভার মার মনের-মতো উত্তর দিলো।

এমন সময় অনুভা এসে ঘরে ঢুকলো। একহাতে চা, আর একহাতে মাখন-রুটি। বেশ দেখাচ্ছিলো তাকে। লালপাড় সাদা সাড়ী পরা, সাদার উপর সাদা ফুল-তোলা ব্লাউজ, খালি পা, কালো ঘন চুল পিঠে ছড়ানো। মুখে মৃদু হাসি—চোখেও ! অমিয় অনুভার ও-রূপ শুধু চোখ দিয়ে দেখলো —মন দিয়ে দেখলো না।

অমিয় বেশ সপ্রতিভ হয়ে অনুভাকে বললো : 'বাঃ, আপনিও তো দেখছি চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন।'

—'তা' বলে মা'র মতো নয়।' অনুভা হেসে উত্তর দিলো।

—'কী রকম ?'

—'এই মা যেমন টাকাগুলোর চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন।'

—'আমাদের কথা সব শুনেছেন বুঝি ?'

—'সব না শুনি—কিছুটা শুনেই বুঝেছি···। কী বলো মা?' চা-খাবার টেবিলে রেখে বললো : 'নিন্, খেয়ে নিন্ এগুলো?'

—'কিন্তু এতো!' অমিয় একটু ভদ্রতা করলো।

—'কৈ আর এতো বাবা?' অনুভার মা বললেন : 'কলেজ থেকে এসে তো আর খাওনি কিছু।'

অতএব খেতে হোলো। অনুভা সামনে থাকায় অনুভার মা তাঁর সাংসারিক গল্প আর জমাতে পারলেন না। জানতেন—আজকালকার মেয়েরা বড়ো চাপা। নিজেদের ঘর-সংসারের কথা অন্য কাউকে জান্তে দিতে চায় না। কেউ জানালে বিরক্ত হয়। কেউ জান্তে চাইলেও বল্তে চায় না। কাজেই মেয়েকে সাম্নে দেখে মা তাঁর সাংসারিক গল্পের ঝাঁপি বন্ধ করলেন। অমিয় বাঁচলো।

'আচ্ছা, তা'হলে আসি, মাসিমা।' অমিয় হেঁট হ'য়ে অনুভার মাকে প্রণাম করে অনুভাকে বললো : 'একদিন মাসিমাকে নিয়ে বেড়াতে আসবেন।'

এতক্ষণ অনুভার মা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু এখন যেন অনুভাকে অমিয়র 'আপনি' বলাটা তাঁর কানে বেমানান লাগলো। বললেন :

—'তুমি বাবা অনুকে 'আপনি' বলছো কেন? ও তোমার ছোট বোনের বন্ধু—তোমারও ছোট বোনের মতো।'

ব্যস্! অমিয়কে চম্‌কে দিয়ে অনুভা তাকে প্রণাম করে বস্‌লো। এতক্ষণ তাই চাইছিলো সে। কিন্তু সঙ্কোচের বেড়া ভাঙতে পারেনি বেচারী। এখন মায়ের 'রায়' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছোটর কর্তব্য করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলো।

অমিয় একটু ঠক্‌লো : 'কী জানি মাসিমা। আজকালকার মেয়েদের হঠাৎ 'তুমি' বল্তে ভয় হয়। হয়তো বা একঘা বসিয়েই দিলো। আর রাস্তায় যেরকম সব 'ডোণ্টো-কেয়ার' করে চলে—দেখলেই তো ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়।'

—'আপনাদের প্রাণ শুকিয়ে দেবার জন্যেই তো ঐ ভাবে চল্‌তে হয় আমাদের।' চালাক মেয়ে অনুভা চটপট্ জবাব দিয়ে দিলো।

—'কেন?'

—'কেন আবার?' অনুভা হেসে বল্‌লো: 'ঐভাবে মুখ-গোমড়া ক'রে হেডমিস্‌ট্রেসী চালে না চল্‌লে রাস্তা চলা যেতো বুঝি?'

—'তাই নাকি?'

—'নিশ্চয়ই। আমরা ভয় দেখাই, তাই পুরুষরা দূরে স'রে থাকে; নইলে ভয়ে আমাদের ঘরে লুকিয়ে থাক্‌তে হোতো—মা'দের মতো! না মা?'

আজকালকার দুটি ছেলেমেয়ের এ ধরণের হাসি-ঠাট্টা-মাখানো কথা কাটাকাটি মন্দ লাগছিলো না অনুভার মায়ের। আজকালকার মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কত সহজে মিশতে পারে—কত অসঙ্কোচে কথা বল্‌তে পারে—তর্ক করতে পারে—; অথচ তাঁদের সময় এতো বড়ো বড়ো মেয়েরা ছেলেদের সাম্‌নে বেরুলে এক মহা অপরাধের ব্যাপার ছিলো। আর, অত বড়ো বড়ো মেয়েরা তো ততদিনে হ'য়ে যেতো তিন-চার ছেলের মা! মা বল্‌লেন: 'আমাদের সময় আমরা ঘরেই থাকতুম্ বটে; তবে পুরুষের ভয়ে লুকিয়ে নয়; বরং পুরুষেরই সুখ সুবিধের জন্যে। আমরা পুরুষের সঙ্গে না দৌড়ে—পুরুষ দৌড়ে এলে তার শ্রান্তি দূর করতাম।'

—'তার মানে'—অমিয় আর একবার ঠুক্‌লো: 'আগেকার মেয়েরা ছিল পুরুষের সত্যিকারের সঙ্গী—আর এখনকার মেয়েরা হচ্ছে একেবারে সিংহী!'

—'ঐখানেই তো আপনারা ভুল করেন—' অনুভা বল্‌লে,— 'আমরা সত্যিকারের সিংহী নই। বরং বল্‌তে পারেন—সিংহীর চামড়ায় ঢাকা হরিণী! সিংহের ভয়ে সিংহী সাজতে হয়েছে।"

—'কী রকম?'

—'একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবেন।' অনুভা বল্‌লো: 'যদিও বলাটা

বোধহয় অন্যায় হবে, কারণ এটা মেয়েদের একান্ত গোপনীয় ব্যাপার—একেবারে যাকে বলে "বিজিনেস্ সিক্রেট"—তবুও বলি : মেয়েরা একেবারে ডাবের জাত, বাইরে শক্ত দেখলেও ভিতরটা বড়ো নরম। রুজ-পাউডার-লিপষ্টিকমাখা মিস্ রায় বা মিস্ সেনকে বাড়ীতে তার ছোট ছোট ভাইবোনদের নাওয়ানো-খাওয়ানো নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়! তার ধুলো-পড়া হাইহিল জুতো আর ভ্যানিটি ব্যাগের খোঁজ পড়ে শুধু বাইরে বেরুবার সময়। এ যেন ষ্টেজে প্লে করার জন্যে ড্রেস করা। আর আপনারাও মেয়েদের "মহিষমর্দিনীর" পার্ট দেখে ভয় পেয়ে যান—গ্রীন-রুমে গিয়ে খোঁজ নেন না—আসলে সে অন্নপূর্ণা।'

—'বাঃ, তুমি তো বেশ কথা বল্‌তে পারো।' অমিয় সত্যিই প্রশংসা করলো।

অমনি অনুভা লজ্জা পেয়ে গেল। কথা গেল থেমে। চোখ নীচু ক'রে শুধু বল্‌লো : 'কিছু মনে করবেন না অমিয়দা—অযথা অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি।'

—'না—না।' অমিয় বল্‌লো : 'বরং সময়টা বেশ ভালোই কাট্‌লো! আচ্ছা, আসি এখন।'

চলে গেলো অমিয়।

* * *

অমিয়র ডায়েরীর কয়েকটি পাতা থেকে :

২৮শে আশ্বিন ১৩৪৮ (ইং ১৫. ১০. ৪১)

মন্দ নয়। আভার বান্ধবী অনুভা মেয়েটি মন্দ নয়। বেশ চটপটে; বেশ কথা বলে; সত্যিই মেয়েরা আমাদের ভয় দেখাবার জন্যেই সিংহী সেজে থাকে; আসলে কিন্তু সিংহীর চামড়ায় ঢাকা হরিণী। সত্যিই মেয়েটি কথা বলবার কায়দা জানে; কিন্তু এতটুকু মেয়ে এত জান্‌লো কী ক'রে? আজকাল মেয়েগুলো বড়ো সবজান্তা হ'য়ে পড়েছে!

অনুভার মা'টিও বেশ। তবে বড্ড বেশি কথা বলেন। অবশ্য ওটা ঠিক ওঁর একলার দোষ নয়—ওঁর জাতের দোষ। এত কথা বলতেও পারে এই মেয়ে জাতটা! বাপস্—আমার এখনও মনে আছে: একবার শ্যামবাজার থেকে খিদিরপুর গেছলাম বাসে। দুর্ভাগ্যক্রমে বসেছিলাম এক লেডিজ সীটের সামনে; কপালগুণে দু'টি মহিলা সেই লেডিজসীট দখল করে বসে এইসা গল্প সুরু করলেন যে, বাস যদি খিদিরপুর শ্যামবাজার অমন দশবার যাতায়াত করতো তবু বোধহয় তাঁদের গল্প শেষ হোতো না।···সব চাইতে ট্র্যাজেডীর ব্যাপার হোলো—আমার যেমন খিদিরপুরে দরকার ছিল—দৈবদুর্বিপাকে তাঁদেরও কেন যেন ঐ খিদিরপুরেই দরকার পড়ে গেছলো! উঃ, কী গল্পটাই করলেন! কোথায় কার ছেলে হতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো; কোথায় কার ছেলে তার বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে, কোথায় কোন্ মেয়ে নতুন চাকরী পেয়ে অহঙ্কারে ডগমগ করছে ইত্যাদি!···আর এতো খোঁজও মেয়েরা রাখতে পারে!

এবার থেকে ঠিক করেছি, মেয়েরা যে বাসে থাকবে সে বাসে উঠবো না; কিংবা উঠলেও মেয়েদের বাক্যবৃষ্টি যাতে কানে এসে না লাগে এমন কোনো নিরাপদ কোণ বেছে নিতে হবে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ (ইং ২০. ১১. ৪১)

জার্মানী আর ইটালীতে মিলে সারা পৃথিবী বোধহয় জয় ক'রে নেবে দেখছি। ইংরেজরা দেখছি নিজের দেশ ছাড়া পশ্চিমের কোনো মাটিতে আর পা দিতে পারবে না।

আজ কাকীমা, আভা আর আমি বালিগঞ্জে ফার্ণরোডে লীনাদের নতুন বাড়ীতে গেছলাম—তাদের গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণে। ওরা আমাদের পাড়ায় বহুদিন ছিলো। লীনার বাবা ললিতবাবুর অমায়িক ব্যবহারে

পাড়ার সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ললিতবাবুর নতুন বাড়ীটি বেশ চমৎকার। খুব আদর যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। তিনি যেন সুস্থ শরীরে তাঁর এই নতুন বাড়ীতে দীর্ঘজীবী হ'য়ে বাস করেন।

২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ (ইং ৭. ১২. ৪১)

জাপান আজ পার্ল হারবার আক্রমণ ক'বে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

গত রবিবারে আমরা বেলগাছিয়া থেকে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে পাতিপুকুরের পরের স্টেশন বাগুইয়াটিতে এক ভদ্রলোকের বাগানে বনভোজন করতে গেছলাম। বেশ জায়গাটি। কলকাতা থেকে মাত্র ৪।৫ মাইলের মধ্যে; অথচ বেশ একটা গ্রাম্য আবহাওয়া আছে। সেখানে 'চিত্তরঞ্জন' কলোনী হয়েছে; অনেক নতুন নতুন বাড়ী হয়েছে সেখানে। আমগাছে দড়ি বেঁধে খুব দোল খাওয়া হোলো। ডাব পাড়িয়েও খাওয়া হোলো।···একটা বেশ মজার ব্যাপার হ'য়েছিলো: বাগানে গিয়েই সবাই চা চা করে হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। চারিদিকের শুক্‌নো খেজুরের পাতা জোগাড় করে এক ইঁটের উনুন ধরানো হোলো। আভা এলুমিনিয়মের হাঁড়ীতে জল গরম করে চায়ের পাতা দিলো ভিজিয়ে। খানিক পরে জমাট-দুধও প্রায় টিন খালি ক'রে ঢেলে দেওয়া হোলো এবং অনুভা থলে থেকে ঠোঙা বার ক'রে চিনি ঢেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে 'চাতালরা' সবাই যার যার মাটির গেলাস নিয়ে এলো এগিয়ে। আধুনিক যুগের 'মহামৃত' সকলের গেলাসে ঢেলে দিতেই সবাই সাগ্রহে এক চুমুক খেয়েই 'থুঃ থুঃ' ক'রে ফেলে দিলো।···ব্যাপার কী?···না, চিনির বদলে অনুভা ভুল করে চায়ের জলে "নুন" দিয়েছে—নুনের ঠোঙা থেকে।···ওঃ, বেচারীর অবস্থা দেখবার মতো হয়েছিলো! অপ্রস্তুত হ'য়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। শেষে কাকীমা, মাসীমা, আভা,

লীনা, আমি অনেক ক'রে বোঝাবার পর তবে ঠাণ্ডা হয়। আবার চা তৈরি হোলো। কাকাবাবু আর ললিতবাবু কলোনীতে বেড়াতে গেছলেন—তাই অনুভার নুন-চায়ের কথা জানতে পারেন নি।

দুপুরবেলা গাছতলায় মাদুর পেতে তাসপেটা হোলো। আভা ও অনুভা গান গাইলো। লীনা নাচলো। আমি তাসের ম্যাজিক দেখালাম। কাকাবাবু "কৌতুক" করলেন। ললিতবাবু কিছুই করলেন না; কেবল প্রতিকথার মাঝে 'মানে-মানে' করতে লাগলেন। যাক্—সারাদিনটা হৈ চৈ করে মন্দ কাটলো না।

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ (ইং ১২. ১২. ৪১)

জাপানীরা যুদ্ধে নেমেছে শুনে কলকাতায় লোকেদের মনে মহা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সবাই দলে দলে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। সত্যি, কলকাতায় এ দৃশ্য অদ্ভুত! ঘোড়ার গাড়ীগুলোর ভেতরে লোক ঠাসা—চালে জিনিষ বোঝাই—ছুটে চলেছে এমন ভাবে যেন মনে হচ্ছে—পেছনে বোধ হয় জাপানীরা তাড়া ক'রে আসছে! 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' কথাটা শুনেছিলাম—এবার চাক্ষুষ দেখলাম।

৫ই পৌষ ১৩৪৮ (ইং ২০. ১২. ৪১)

জাপানীদের ভয়ে আজ আমরাও কলকাতা ছাড়ছি। কাকাবাবু একলা বাড়ীতে থাকলেন—চাকরীর খাতিরে। চাকরটা "অস্থায়ী গৃহিনী" পদে উন্নিত হোলো। আমরা চলেছি কুষ্টিয়ায়; কলকাতা থেকে ১১১ মাইল দূরে। কাকীমা, আভা আর সেই সঙ্গে যাচ্ছেন অনুভার মা ও অনুভা। আমি চলেছি এঁদের 'রক্ষক' হিসাবে। অনুভাদের দেশ বলে কিছু নেই এবং অভিভাবকহীন দু'টি মেয়েমানুষ এই বিপদে একলা কলকাতায় থাকা বিপজ্জনক মনে করায় আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন।

২০শে ফাল্গুন ১৩৪৮ (ইং ৪. ৩. ৪২)

কুষ্টিয়া জায়গাটা মন্দ লাগছে না। সকাল বিকেল গড়াই নদীর ধারে বেড়াই। পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বই এনে দুপুর বেলায় পড়ি। সন্ধ্যার পর হাইরোডে চায়ের দোকানে বসে হিটলার, মুসোলিনী, চার্চিল, তোজোর শ্রাদ্ধ করি। দিব্যি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছি। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, আশা নেই, হতাশা নেই,—মন্দ নয়। জীবনের দিন-গুলো থেকে কটা দিন স্রেফ ফাঁকি দিয়ে কাটানো—মন্দ কী?

কাকীমারা বেশ কাজ ভাগ ক'রে নিয়েছেন। একবেলা কাকীমা, আর একবেলা মাসীমা রাঁধেন। আভা ঘর ঝাঁট দেয়, তরকারী কোটে। আর অনুভা বিছানা পাতে আর কুয়ো থেকে জল তোলে। দুপুরে মেয়েরা দল বেঁধে পাড়া বেড়াতে যান—পরের ঘরের খবরাখবর আনবার জন্যে; যেন, খবরের কাগজের রিপোর্টার। আমি নিজের ঘরে শুয়ে লাইব্রেরীর বই মুখে দিয়ে বাড়ী আগলাই। মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে জানলার বাইরে চেয়ে দেখি নদীর ধারের তেঁতুলগাছটা রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নদীতে পাল তুলে দিয়ে ভারী ভারী নৌকো কেমন তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে। নদীর ওপারে বেনেপাড়ার চর দেখা যায়, আমন-ধান চাষা কেটে নিয়েছে—বুনেছে ছোলা-মটর। তারই সবুজ শাকে সারা মাঠ সবুজে হ'য়ে আছে। আরো দূরে দেখা যায় স'রে স'রে যাওয়া কালো ধোঁয়া; পদ্মায় স্টীমার চলেছে পাবনার দিকে।…বেশ লাগে।

২৪শে চৈত্র ১৩৪৮ (ইং ৭. ৪. ৪২)

আজ আমরা সবাই কুষ্টিয়ায় মোহিনীমিল দেখতে গেছলাম। যুদ্ধের জন্যে কেবল তাঁবু তৈরি হচ্ছে। ইঞ্জিনঘরের বিরাট যন্ত্রদানব মানুষের হাতে বন্দী হ'য়ে যেন সরোষে গর্জন করছে। অনুভা বড়ো ভীতু। আমার হাত ধ'রে টেনে আনলো বাইরে। বেচারীর কপাল ঘেমে গেছে। বললো: 'আমার মাথার মধ্যে কী রকম করছে—একটু জল আছে অমিয়দা?'

কাছেই জল ছিলো—রুমাল ভিজিয়ে তার মাথায় চেপে ধরলাম। খানিকটা জল তার হাতে দিলাম, সে নিজের চোখে মুখে দিলো ছিটিয়ে। পরে তাকে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে বসিয়ে দিলাম। ততক্ষণে কাকীমার' এসে পড়লেন। তাঁরা আবার তাঁতের ঘরে ঢুকলেন মিলের একটি লোকের সঙ্গে। অনুভা আর মিলের ভেতর যেতে রাজী হোলো না। কাজেই অনুভার কাছে আমাকেই থাকতে হোলো। মিলের ভেতরটা দেখা হোলো না। অবশ্য আগে ছোটবেলায় দেখেছি।·· তা' অনুভা অনেকবার বললো :

—'আমি ভেতরে গেলাম না ভয়ে। আপনি গেলেন না কেন?' বললাম : 'তোমাকে সহানুভূতি দেখাবার জন্যে।'

অনুভা বললে : 'সত্যি, আমার জন্যে আপনার দেখা হোলো না। বড়ো লজ্জা করছে।'

হেসে বললাম : 'তা হ'লে বাড়ীতে গিয়ে দু'টি কম করে খেও কিন্তু।'

১লা বৈশাখ ১৩৪৯ (ইং ১৪. ৪. ৪২)

অনুভা কবিতা লিখতে পারে জানতাম না তো! দুপুরবেলায় মেয়ের দল পাড়ায় বেড়াতে বেরুবার পর, লাইব্রেরীর বই খুঁজতে গিয়ে দেখি—বইয়ের তলায় একখানা ছোট খাতা। তাতে অর্ধেক লেখা একটি কবিতা :

এলো আজি নূতন বরষ
হে সুন্দর! দিবে কবে মনের পরশ?
আশাপথ চেয়ে আছি—

আর লেখা নেই দেখে "দুষ্টু বুদ্ধি" মাথায় চাপলো। কলমটা বার করে ঐ কবিতার তলায় লিখলাম :

আশা পথ চেয়ে আছি
হয়েছি morose



(তাই) মুখেতে তুলিনি হায়
ভাতের গরস।
যখন মরিব দেখো
হবে আফশোষ ॥
অতএব দাও এসে
মনের পরশ ॥

২রা বৈশাখ ১৩৪৯ (ইং ১৫. ৪. ৪২)

বাপ্‌স্‌! কেউটের ল্যাজে পা দিয়েছি। সকালে বাজার ক'রে এসে দাঁড়াতেই—অনুভা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার ব্লাউজের ভিতর থেকে একখানা ভাঁজ-করা চিঠি আমার হাতে দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বললো : 'দুপুরে পড়বেন।'

বললাম : 'এখন যদি পড়ি ?'

বললো : 'এখন পড়লে মাথার দিব্যি রইলো। যা বললাম তাই করবেন।'

তাই দুপুর বেলায় পড়লাম :

অমিয়দা,

আমাকে এভাবে অপমান করবার কারণ কী ? আপনি কি ভেবেছেন কবিতাটি আপনাকে লক্ষ্য ক'রে লিখতে গেছলাম—তাই আপনি যা-ইচ্ছে-তাই ক'রে ভেঙ্‌চি কেটেছেন ? আপনাদের আশ্রয়ে আছি—তাই চান ভাতের গরস যেন মুখে না তুলি—না ? বেশ।···আর আমি কে, বা আমার কে আছে যে আমি মরলে আফশোষ করবে ? এভাবে বিদ্রূপ করবার কোনো দরকার ছিলো না।

—অনুভা।

চিঠিখানা পড়ে কেমন যেন অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। ভাবলাম : অনুভার কবিতার খাতায় এভাবে অনধিকার চর্চা করবার জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ··কিন্তু সারা বিকেলটা তার দেখা পেলাম না। অন্যদিন অনুভাই আমাকে চা-খাবার দেয়; আজ দিয়ে গেলো আভা। আভাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম অনুভা পাশের বাড়ীর যূথিকার সঙ্গে কোর্টপাড়ায় বেড়াতে গেছে—সন্ধ্যার পর আস্‌বে।

কাকীমারা সন্ধ্যার মধ্যেই তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ৺গোপীনাথবাড়ী গেলেন। আমি বাড়ী পাহারায় থাকলাম। সামনে দক্ষিণের খোলা ছাদে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে, মাদুর বালিশ নিয়ে সবে আধ-শোয়া হ'য়ে Meek Heritage-এর কয়েক পাতা উল্টেছি—এমন সময় কে যেন আমার পায়ে হাত দিলো। একমনে পড়ছিলাম—হঠাৎ পায়ে কী লাগতেই ভয়ে চম্‌কে উঠ্‌লাম। আধো অন্ধকারে চেয়ে দেখি, অনুভা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—'আমার মাপ করুন, অমিয়দা। ওভাবে চিঠি লেখা আমার খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে।'

বললাম : 'অন্যায় তো আমারই হয়েছে; ওভাবে পরের খাতায় অনধিকার চর্চা করতে যাওয়া বোকামি। ভেবেছিলাম তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো।'

অনুভা বল্‌লো : 'আর লজ্জা দেবেন না। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় আর আপনার সামনে আস্‌তে পারিনি। আভারা সব গোপীনাথবাড়ী গেছে বুঝি ?'

—'হ্যাঁ।' বল্‌লাম।

—'যাক্—ক্ষমা করলেন তো ?'

'যদি মনে ক'রে থাকো—দোষ করেছো তবে ক্ষমা করতেই হবে।

তবে জেনে রাখো দোষ আমারই ; আমাকে তুমি ক্ষমা করো।—যাক্ তুমি বাড়ীতে থাকো। আমি একটু বেরিয়ে কাজ সেরে আসি।'

বই বন্ধ করে উঠতে যাচ্ছিলাম—এমন সময় অনুভা এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বস্‌লো : 'কী কাজ শুনি ?'

কী কাজ! কোনো কাজই নয়। অন্ধকারে ভরা নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জনহীন বাড়ীতে আমাদের একসঙ্গে থাকা আমি উচিত মনে করিনি—তাই বাইরে গিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সে কথা কি বোঝে না অনুভা ? অন্তত, অনুভার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ? উত্তর দিলাম :

—'আছে একটু কাজ।'

—'আমাকে বলতে বাধা আছে বুঝি ?'

বললাম : 'তা আছে বৈকি !'

—'পর ব'লে বুঝি ?'

বল্‌লাম—'যা মনে করো।'

—'পরকে ঘর দিয়ে আপনি ঘুরবেন পথে পথে ; আর পর ঘরে থেকে ঘরের লোককে করবে ঘরছাড়া! এও কি কখনো হয় ? আমি বরং ততক্ষণ যুগিকার কাছে গিয়ে বসিগে। আপনি ঘরের ছেলে ঘরেই থাকুন।' বলেই অনুভা ছাদ থেকে চলে যাচ্ছিলো—আমি তার আঁচল চেপে ধরলাম : 'কী ছেলেমানুষী করছো অনুভা ? তোমার মনে এভাব এলো কেন বলো তো ? কখনো কি আমার কাছে সে রকম ব্যবহার পেয়েছো ?' অনুভার আঁচল ছেড়ে দিলাম—সে আলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে দেখলাম—তার চোখদু'টি জলে ভরে গেছে। সস্নেহে বললাম : 'ও আবার কী ? চোখে জল ? মুছে ফেলো দুষ্টু মেয়ে। আজ থেকে তুমি আভার মতো আমাকে 'তুমি' বলবে। 'কাছে থেকে দূর রচা' বন্ধ করো—দেখবে তোমার মনের ঐ

অদ্ভুত ভাব ক্রমে কেটে যাবে। আমি একটু বেরুই—সত্যিই সারাদিন বাড়ীতে বন্ধ হ'য়ে আছি। তুমি তো সারাদিন বেড়ালে।' আবার জিজ্ঞেস করলাম: 'যাই আমি?'

চোখের জল মুছে অস্ফুট স্বরে অনুভা বল্‌লো: 'এসো।'

৭ই বৈশাখ ১৩৪৯ (ইং ২০. ৪. ৪২)

বিশেষ কাজে আজ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি। কাকীমা, মাসীমা, আভা, অনুভার অনেক জিনিষের ফর্দ আছে—যথা: দাঁতের মাজন, কাঁচের গেলাস, খেলো মার্কিন, কাপ-ডিশ্, টর্চের ব্যাটারী, এমন কী পাতিলেবু। আভা বলে দিয়েছে ব্লাউজপীস্ আর ফটোর এলবাম খানা আনতেই হবে—তার বান্ধবীদের ছবি দেখাবে। আর অনুভার ইচ্ছে, তার জন্যে যেন একশিশি জবাকুসুম তেল, হিমানী স্নো আর অজন্তা ফেস্ পাউডার নিয়ে যাই; আর মনে থাকে তো চকোলেট। পাঁচ টাকার নোট একখানা দিতে এসেছিলো; এক ধমক দিতে নোটখানা নিজের হাতেই মুড়ে রাখলো।···অনুভা একটা বড়ো অন্যায় করছে, কানে বড়ো বিশ্রী লাগে: আমাকে একলা পেলে 'তুমি' বলে, অথচ সকলের সামনে বলে 'আপনি'।—কেন?

কলকাতা একেবারে শূন্যপুরী হ'য়ে গেছে। দিনের বেলায় পথ চল্‌তে গা ছম্ ছম্ করে। সব বাড়ীতেই প্রায় তালা-চাবি লাগানো। যে দু'দশজন লোককে দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় মানুষের প্রেতাত্মা যেন তারা। অলিগলি দিয়ে যাবার উপায় নেই—হয়তো পেছন থেকে গুণ্ডা এসে পিঠে ছুরি বসাবে। রাস্তা দিয়ে ট্রামগুলো বেসুরো ঠং ঠং শব্দ করে ঘড় ঘড় কর্‌তে কর্‌তে চলে—লোক ওঠানামার জন্যে বেশি থামতে হয় না। ক্রমে সন্ধ্যা হয়। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় আর লোক দেখা যায় না। শুধু সিভিক-গার্ডের লোকেরা মাঝে মাঝে

ভারী বুট জুতো আর মোটা লাঠি নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় খট্ খট্ ক'রে পাড়া মাতিয়ে ঘুরে বেড়ায়। জাপানী-বোমা বর্ষণের ভয়ে কলকাতা মহানগরী সসঙ্কোচে গাঢ় অন্ধকারের কালো কাপড়ের তলায় নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না এসে তার ঐ আবরণ খুলে দেয়—শত্রুকে বুঝি দেখিয়ে দেয়—ঐ যে মহানগরী, ভয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে! যুদ্ধের আগে এতদিন আলোক-সজ্জিতা মহানগরী জ্যোৎস্নাকে অবহেলা ক'রে এসেছে, তাকে প্রকাশ হ'তে দেয়নি। আজ তাই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জ্যোৎস্না মহানগরীর বুকের উপর পড়ে, তার আবরণ খুলে দিয়ে শত্রুকে দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ দেখো গর্বিতা মহানগরী আজ সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে আছে কেমন অসহায় ভাবে! আঘাত করো ওকে।... জ্যোৎস্নাকে আগে সবাই চেয়েছে—প্রেমিক প্রেমিকারা চেয়েছে, কবিরা চেয়েছে। আর এখন? বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক মানুষ আমরা —আমাদের প্রাণে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই। তাই জ্যোৎস্নাকে আমরা ভয় করি—অন্ধকারই আমাদের বন্ধু!

১০ই বৈশাখ ১৩৪৯ (ইং ২৩. ৪. ৪২)

কুষ্টিয়ায় ফিরে এসেছি। আবার সেই কুঁড়েমি। বেড়ানো, খাওয়া শোয়া—আর শোয়া, খাওয়া, বেড়ানো।

*　　*　　*　　*

একটা কিছু ঘটবে ভেবে যদি সেই মতো ব্যবস্থা করা যায়,—অথচ পরে দেখা যায় যে, সেটা ঘটলো না, তখন মেজাজটা সত্যিই যায় বিগড়ে; হয়তো বাড়ীতে কেউ আসবে বলে ঘরদোর ভালো করে সাজানো হোলো, রান্নাঘর থেকেও আস্তে লাগলো জীবের-জল-আসা নানা রকমের সুগন্ধ

—এমন সময় খবর এলো—যাঁর আসার কথা ছিল তিনি বিশেষ কারণে আস্‌তে পারবেন না। মনের অবস্থাটা কী হয় তখন? এ তো তবু স্বাভাবিক। ভালো কিছু হতো অথচ হোলো না—এতে কার না মন খারাপ হয়!···কিন্তু শুনতে আশ্চর্য লাগলেও—এটা সত্যি যে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে ভেবে তা' থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা কর্‌বার পরেও যদি দেখা যায় —সত্যিই সেরকম খারাপ কিছু ঘটলো না—তখন মনটা বিরক্তিতে যায় ভরে। অবশ্য এ বিরক্তিটা নিজের উপরই হয়। নিজের ভীরুতার জন্যে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। অমিয়দের অবস্থাও হোলো অনেকটা এই রকম; শুধু অমিয়রা কেন—জাপানী বোমার ভয়ে যারা কলকাতা থেকে পলাতক হয়েছিলো সকলেরই। সকলেই যখন বহু অর্থ ও সময় অপব্যয় করে এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করে দেখলো, জাপানী-বোমা কলকাতার বুকে প'ড়ে কলকাতাকে উড়িয়ে দিলো না,—তখন কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে একে একে সবাই কলকাতায় ফিরে আস্‌তে লাগলো। শ্যামবাবু বোমার ভয়ে পালালেন না দেখে রামবাবু পালাবার সময় শ্যামবাবুকে সহানুভূতি জানিয়ে গেছ্‌লেন। এখন অর্থ, স্বাস্থ্য, সময় নষ্ট করে রামবাবুকে ফিরে আসতে দেখে শ্যামবাবু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন: 'সব ভালো তো?'

অমিয়র কাকাও কুষ্টিয়ায় লিখলেন: 'আর কেন? এবার সবাই চলে এসো।'

কাজেই অমিয়রা সবাই আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে এলো—কেমন যেন বোকার মতো—নিজেদের উপর বিরক্ত হ'য়ে। শুধু ওদের মধ্যে একজনের মনের পেয়ালা ছিল খুসীতে ভরা। সে কলকাতা ছেড়ে গিয়ে কিছুই হারায়নি—বরং পেয়েছে। অনুভা অমিয়কে পেয়েছে মনে মনে।

অমিয়রা শিয়ালদা স্টেশনে নেমে দেখলে মহানগরী আবার জন-

কোলাহলে মুখরা হ'য়ে উঠেছে। সারা সহরে জেগেছে চাঞ্চল্য। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতা। সশস্ত্র সৈনিকরা সহরময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিক্ষুব্ধ জনতা নানা রকম 'জয়ধ্বনি' করছে।

অমিয়র কাকাবাবু স্টেশনে এসেছিলেন। সারামুখে তাঁর দুশ্চিন্তার রেখা আঁকা। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে তার সব দরজা জানালা বন্ধ করে অলিগলি দিয়ে সবাইকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন তিনি। গাড়ীতে বললেন তিনি : 'হঠাৎ দুপুর থেকে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বড়ো রাস্তায় জনতা ও পুলিশে প্রায়ই মারামারি হচ্ছে, সৈন্যেরা যখন-তখন যার-তার উপর গুলি চালাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য দেশনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জনতা ট্রাম পোড়াচ্ছে—ডাকঘর লুঠ করছে—রেলের লাইন উঠিয়ে ফেলছে। এই আন্দোলন নাকি স্বাধীনতা লাভের জন্যে।'

অমিয়র কাকীমা সব শুনে বললেন : 'দেখছি—এখন না এলেই ভালো হোতো!'

পরদিন বিকেলে অমিয়র বন্ধু সমীর এলো অমিয়র কাছে : 'তোকে পরশু খুঁজতে এসে শুনলাম—তোর কাল আসবার কথা। তাই আজ এলাম। বিশেষ জরুরী।'

—'কী ব্যাপার ?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

সমীর অমিয়কে ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে জামার পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বার ক'রে বললো : 'তুই দেশের ছেলে তো ?'

—'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

—'সারা দেশময় আন্দোলন সুরু হয়েছে দেখেছিস্ তো ?'

—'তা তো দেখছি !'

—'তোকে দেশের কাজ করতে হবে।'

—'কী কাজ ?'

—'এই কাগজে যা লেখা আছে, তা' অন্তত একশ'খানা কাগজে বড়ো বড়ো করে লিখে রাত্রের মধ্যেই দেওয়ালে দেওয়ালে আটকে দিতে হবে। যেন ধরা না পড়িস্! খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। কারণ ধরা পড়লে শুধু তুই ন'স্—এদলের অনেকেই ধরা পড়ে যাবে।'

—'দলে কে কে আছে?'

'—আমি, যদু, রমেন, নিখিল, প্রবোধ—আরো অনেকে। মেয়েরাও আছেন।···তোর উপর আমাদের প্রচার-বিভাগের ভার পড়েছে।'

অমিয় এতক্ষণ আশ্চর্য হয়ে শুনছিলো আর কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করছিলো। এবার বল্‌লো :

—'আমাকে তোরা বিশ্বাস করেছিস্ এবং এ কাজের উপযোগী বলে মনে করেছিস্ সেজন্যে তোদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু বাড়ীতে বসে এসব লেখা তো চলবে না?'

—'কেন?'

—'জানিস্ই তো—কাকাবাবু সরকারী চাক্‌রে। অবশ্য আমার উপর যে কাজের ভার পড়েছে, তা আমি করবো,—জেনে রাখ্। দে তোর কাগজ।'

সমীর কাগজটা দিয়ে চলে গেলো। অমিয় ভাঁজ খুলে দেখ্‌লো : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং নানারূপ উত্তেজক, চাঞ্চল্য-কর বিবৃতি!

অমিয় জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে একগোছা পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে তখনি ছুটলো অনুভাদের বাড়ীতে। পথে দোকান থেকে কিনে নিলো লাল কালির বড়ি। অনুভার মা ফলাহার করছিলেন—তাই দরজার কড়া নাড়তেই অনুভা এসে দরজা খুলে দিলো :

—'অমিয়দা' তুমি! এত রাত্রে!' অনুভা অবাক হয়ে বললো।

অমিয় বল্‌লো : 'মাসীমা কোথায়?'

—'খাচ্ছেন।'

—'ভালোই হয়েছে। তোমাকেই দরকার আমার।'

—'আমাকে দরকার?' অনুভার রক্তের মধ্যে সহসা কেন যেন চাঞ্চল্য জেগে উঠ্‌লো।

অমিয় বল্‌লো: 'এদিকে সরে এসো অন্ধকারে।' দরজার আড়ালে সরে এলো দুজনে: 'কাউকে বলবে না বলো?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুভা বল্‌লো: 'না!'

—'আমার গা ছুঁয়ে বলো।' অমিয় তার হাত এগিয়ে দিলো।

—'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—' পা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাঢ় সুরে বল্‌লো: 'আমায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না? তুমি যা বলবে নিঃসঙ্কোচে বলো। সে কথা তুমি আর আমি ছাড়া কাক-পক্ষীতেও জানবে না।'

—'আমি যা বলবো তা করতে পারবে?'

—'পরীক্ষা করে দেখো।'—অনুভার মাথা ঘুরতে লাগলো: 'তুমি যা' বলবে, আমি তা করবো না—এতো আমি ভাবতেও পারি না অমিয়দা।'

—'তবে এই নাও কাগজখানা। এতে যা লেখা আছে, তা' এই লালকালি গুলে নিয়ে এই খবরের কাগজগুলোতে বড়ো বড়ো হরপে লিখতে হবে। পারবে তো?'

এই! শুধু এই! এরই জন্যে এত ভূমিকা! এত কথা! আশাহতা অনুভা হাত বাড়িয়ে, শুক্‌নো গলায় শুধু বল্‌লো: 'পারবো—দাও।'

সব বুঝিয়ে দিয়ে অমিয় বল্‌লো: 'আজ ভোর-রাত্রে অন্ধকার থাকৃতে এখানে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার কাশবো। তুমি তখনি কাগজের বাণ্ডিলটাকে উপর থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জানলা দিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়ো। কেউ জানবে না। পারবে তো? না, ঘুমিয়ে পড়বে?'

—'পারবো। ঘুমোবো না।' গম্ভীর হয়ে অনুভা বল্‌লো: 'কিন্তু এসব কী—জানতে পারি কি?'

—'দেশের কাজ।' অমিয় বল্‌লো : 'তুমি দেশের মেয়ে—দেশের একটু কাজ করো।'

—'অন্তত তুমি যখন বল্‌লে তখন নিশ্চয়ই করবো।···এসো ভেতরে এসো।'

অমিয় ভেতরে গিয়ে অনুভার মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো : 'কী, মাসীমার খাওয়া দাওয়া হোলো?' প্রশ্নের জবাব না নিয়েই অনুভার হাতের কাগজগুলো দেখিয়ে বললো : 'এই দেখুন না—বেরুবার সময় আভা তার ব্লাউজের ডিজাইনের খাতাখানা দিয়ে বললে অনুভাকে দিতে। এতক্ষণে সময় পেলাম। ফেরৎ নিয়ে গেলে আবার মেয়ের মুখ হাঁড়ি হয়ে যেতো।'

—'তা যা বলেছো, বাবা। দুই বন্ধুর ভাবের ঠেলায় তুমি গেলে দেখছি!' অনুভার মা বললেন।

—'তাই দেখুন একবার।···আচ্ছা, আসি এখন।'

অমিয় চলে গেলো।

অনুভা কাগজপত্রগুলো লুকিয়ে রেখে বিছানায় উপুড় হ'য়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে লাগলো অভিমানে, কাঁদতে লাগলো লজ্জায়, হতাশায়, ব্যর্থতায়—দিশেহারা হয়ে। বড়ো আশা ক'রে হাত পেতেছিলো সে; কিন্তু যা পেলো তা তো সে চায়নি! তবু তাকে হাত পেতে নিতে হোলো—যে দিলো, তার মন রাখতে। মন রাখা! হায়রে, মন-রাখা বুঝি শুধু তারই কাজ? তার মন-রাখার কথা তো কেউ ভাবে না!······

অনুভা অভিমানে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। চোখের জলে বালিশ গেলো ভিজে। অন্ধকার ঘরখানা চাপা কান্নার শব্দে ভরে গেলো। বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ এসে কণ্ঠনালি দিতে লাগলো রুদ্ধ ক'রে। রুদ্ধ আবেগে অশ্রুমতীর তনুদেহখানি ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলো।

অনুভা বালিশটাকে বুকের মধ্যে চেপে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলো। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলো: বেশ! তাই হোক্। তার কর্তব্য সে করে যাবে—উপরে যিনি আছেন তিনি তো দেখবেন।

এমন সময় অনুভা তার মার পায়ের শব্দ পেয়ে, চুপ করে মড়ার মতো রইলো পড়ে। মা ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে দেখলেন—মেয়ে ঘুমুচ্ছে; কাজেই তিনি তাঁর নিজের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সেরে—ঠাকুরের নাম করে শুয়ে পড়লেন। খানিক পরেই শোনা গেলো তাঁর নাসিকা-ধ্বনি। অনুভা অতি সন্তর্পণে উঠে বস্‌লো। কাপড়টাকে গুছিয়ে পরে নিয়ে, কাগজপত্রগুলো বার করে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। তারপর একটা মোটা মোমবাতি জেলে নিয়ে লাল কালি গুলে নিয়ে সুরু করলো তার কাজ—। তার কাজ নয়—অমিয়র কাজ। অমিয়র কাজ নয়—দেশের কাজ।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চললো লেখা। লেখার পর লেখা। ছোট ছোট অক্ষরে কালো কালিতে ছাপা খবরের কাগজের উপর লাল রংয়ের মোটা-মোটা গোটা-গোটা অক্ষরগুলো আধো অন্ধকারে বোবা হয়ে প'ড়ে আছে সারা বারান্দায়। কাল তারা পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে প'ড়ে নতুন আলোর পরশ পেয়ে নীরব চীৎকারে জানাবে তাদের বক্তব্য! অনুভা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে লাগলো। ক্রমে যখন সব কাগজ-গুলো শেষ হয়ে গেলো, অনুভা সব গোল করে মুড়ে বাণ্ডিল বেঁধে একটা লম্বা দড়ির সঙ্গে একদিকটা বাঁধলো।

অনুভার সারা শরীর ক্লান্তিতে ভরে গেলো। চোখের পাতা ঘুমে ভারী হ'য়ে এলো; তাই কলঘরে গিয়ে চোখে, মাথায়, ঘাড়ে জল দিয়ে আবার নিজের বিছানায় এসে শুলো। কত রাত্রি হয়েছে কে জানে! অমিয়দা কখন আসবে কে জানে! পাছে ঘুম এসে যায়—তাই ঘরের গাঢ় অন্ধকারে

অনুভা চোখদু'টো বড়ো বড়ো করে চেয়ে রইলো। নিস্তব্ধ রাত্রের প্রতিটি শব্দ তার কানদু'টো সজাগ হ'য়ে লাগলো শুনতে।

ঐ, ঐ যে কাশির শব্দ। কাশির শব্দই তো! অনুভা নিঃশব্দে উঠে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালো : কৈ, কেউ তো নেই !···এমন সময় আবার কাশির শব্দ হ'তে ভালো করে লক্ষ্য ক'রে দেখলে—দূরে একটা ছায়া-মূর্তি দাঁড়িয়ে। অনুভা তাড়াতাড়ি কাগজের বাণ্ডিলটা জানালা দিয়ে নামিয়ে দিলো। খানিকটা নামতেই নীচেকার টানে অনুভার হাতের দড়ি মুঠি থেকে বেরিয়ে গেলো। ছায়ামূর্তিকে আর দেখা গেলো না।

পরদিন সকালে অনুভা দেখ্‌লো—তাদের বাড়ীর সামনের দেওয়ালে লাগানো আছে তারই হাতে-লেখা একখানা প্রাচীরপত্র ! অনুভা নিজেকে ধন্যবাদ দিলো—কর্তব্য করতে পেরেছে ব'লে।

আন্দোলনের চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যেতে লাগলো :

আমেদাবাদে জনতার উপর গুলিবর্ষণ। গেণ্ডারিয়া রেল-স্টেশনে অগ্নি-সংযোগ। কলিকাতা অভিমুখী লোকাল ট্রেনে আগুন। হাটখোলা ডাকবাক্সে অগ্নি-সংযোগ। মহীশূর রাজ্যে গুলি চালনায় তিনজন নিহত। গড়পার পোস্ট-অফিসে অগ্নি-সংযোগ। বিজাপুরের নিকট রেল-স্টেশন ভস্মীভূত। বোম্বাইয়ে পুলিশের লাঠিচালনা। তমলুকে সান্ধ্য আইন জারি, শঙ্খধ্বনি নিষিদ্ধ। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে পাই-কারী জরিমানা। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বিক্ষোভের আগুন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। নিত্য-নূতন চাঞ্চল্যকর খবর—খবরের কাগজের উপর লাল কালিতে হাতে লিখে বেরুতে লাগলো। অমিয় নানা জায়গা থেকে খবর জোগাড় করতে লাগলো। অনুভা সে সব খবর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ক্রমাগত লিখে

যেতে লাগলো। অমিয়কে—অমিয়কে খুশী সে করবেই। পাষাণ যদি গলে অমিয়ও গলবে, বুঝবে, চিনবে তাকে। অনুভা সেই অনাগত সুদিনের আশায় ধৈর্য ধরে রইলো। নিদ্রিত ভারত জেগে উঠেছে। সারা দেশময় জেগেছে চাঞ্চল্য। অথচ অনুভা দেখলো—লক্ষ্য করলো: এ চাঞ্চল্যে ইন্ধন জোগাচ্ছে যে সেই অমিয়র হৃদয় রয়েছে অচঞ্চল। অমিয় আসে, খবরগুলো দিয়ে যায়—নানা রকম উপদেশ দিয়ে যায়, শেষে অনুভার মায়ের সঙ্গে দু'টো কথা ব'লে চ'লে যায়। তার কি আর কোনো কথা বলবার নেই অনুভাকে? একটু কাছে বসা, একটু মৃদু হাসা, একটু বা অকারণ কথা বলা—এসবের কি কোনো দামই নেই? এত যে মন-রাখা, এত যে কথা-রাখা—কেন? কেন?...আর কেন? অনেক হয়েছে—আর নয়!...অনুভা কী করতে চায়?

—'অমিয়দা—' অমিয় এলে অনুভা বল্‌লো: 'একটা কথা বলতে চাই।'

—'বলো।' উদাসীন অমিয় বল্‌লো।

—'আমার দ্বারা এসব লেখা আর চল্‌বে না।'

চম্‌কে উঠ্‌লো অমিয়: 'কেন কী হোলো তোমার?'

—'এম্‌নি! আমার ইচ্ছে।'

—'কিন্তু আমার ইচ্ছের কি কোনো দামই নেই তোমার কাছে অনুভা?'

—'এতদিন ছিলো—তাই অনেক কিছুই করেছি তোমার জন্যে—নয় কি?' অনুভার মুখে বিদ্রূপের হাসি।

'আমার জন্যে করেছো?' অমিয় অবাক হোলো: 'দেশের জন্যে নয়?'

—'যদি বলি 'না'?'

অনুভা অমিয়র উত্তর চাইলো। উত্তর পেলো, যখন দেখলো, অমিয় একটি কথাও না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

*　　　*　　　*

সেই যে চ'লে গেলো অমিয় আর তার দেখা নেই। তারপর কতদিন গেলো—অমিয় আর এলো না অনুভাদের বাড়ীতে। আগে তবু একটা কাজে আস্‌তো—সে-কাজে আসা তো সে-ই দিয়েছে বন্ধ ক'রে। আর দেশ ব্যাপী আন্দোলনও ক্রমে শান্ত হ'য়ে গেলো।—

অন্যায় হয়েছে। অমিয়কে ওভাবে দু'কথা শোনানো উচিত হয়নি তার। অনুভা নিজের ওপর রাগতে লাগলো। এক-একবার ইচ্ছে হোলো—নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসে অমিয়র কাছে। কিন্তু যেতে লজ্জা করে—সঙ্কোচ হয়। কোন্ মুখ নিয়ে অমিয়র কাছে গিয়ে দাঁড়াবে সে?

কিন্তু সুযোগ একদিন হোলো অনুভার—যখন চারিদিকে নতুন করে দেখা দিলো দুর্যোগ। ডিসেম্বরের শেষাশেষিতে বহুদিনের আতঙ্ক সত্যে পরিণত হোলো। জাপানী বোমা এসে পড়লো কলকাতার আশে পাশে—শেষে মাঝ-কলকাতায়। বিপদ যতক্ষণ না আসে মানুষ ততক্ষণই বিপদের ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়; কিন্তু যখন বিপদ এসে পড়ে তখন মানুষ আতঙ্কের বাঁধন কাটিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে। তাই কলকাতায় সত্যিই বোমা যখন পড়লো,—তখন না-পড়ার সময় যত লোক পালিয়েছিলো তার চারভাগের একভাগ লোকও বোধহয় পালালো না। যারা পালালো তারা বেশির ভাগই অবাঙালী। খোট্টা গোয়ালারা পালালো গোরু বেচে দিয়ে। খোট্টা ঠেলা-ওয়ালারা পালালো ঠেলা-গাড়ীতে বৌ-ছেলে-মেয়ে চাপিয়ে নিয়ে। গুজরাটী পালালো তার দোকানপাট বন্ধ করে; মাড়োয়ারী পালালো তার ব্যবসা উঠিয়ে দিয়ে। বাঙালী ভাবলো—বাঙলা দেশ বুঝি বাঙালীরই হোলো।

বাঙালীও কি পালালো না? পালালো বৈকি!—যাদের প্রাণের মায়া বেশি। পালালো—যাদের পালাবার ভালো জায়গা আছে। আর অনেকে বুঝতেই পারলো না—এবার সত্যিই পালাবে কিনা। অনুভার

মাও মনস্থির করতে পারলেন না। তাই মেয়েকে বললেন : 'একবার বিকেলে যাস তো অনু অমিয়দের বাড়ী—শুনে আসিস্ তাঁরা এবার বাইরে যাবেন কিনা ?'

অন্য সময় হোলে অনুভা তার মায়ের এককথায় রাজী হোতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন আর এ সুযোগ ছাড়লো না—রাজী হয়ে গেলো। গোপনে অমিয়র নামে একখানা চিঠি লিখে নিলো। ঠিক করলো—চিঠিখানা অমিয়র পড়ার বইএর মধ্যে গুঁজে রেখে আস্‌বে—যাতে তার চোখে পড়ে। তার চিঠি পেয়েও কি অমিয় আসবে না ?—দেখাই যাক্ না।

দুর্যোগের সুযোগ পেয়ে অনুভা অনেক দিন পরে অমিয়দের বাড়ীতে গিয়ে তার বইএর মধ্যে গুঁজে দিয়ে এলো তার মিনতি-মাখানো চিঠি : 'অমিয়দা তুমি ক্ষমা করো—তুমি এসো।'

—দুই—

অমিয়দা আস্‌বে, আস্‌বে—নিশ্চয়ই আস্‌বে।...

উপরের ঘরের জানলার ধারে বসে অনুভা ভাবছিলো: না এসে সে থাকতে পারবে? তবে চিঠিটা পেলে হয়! ইকনমিক্সের বই-এর মধ্যে তো গুঁজে এলুম! এখন অমিয়দা যদি সে বই না খোলে?...তা নাই-বা খুল্‌লো! চিঠির খানিকটা তো বইএর থেকে বার করে রেখেছি। চোখে পড়বে নিশ্চয়ই! তবে আর কারো চোখে না পড়ে! তা' আর কী করবো?

অনুভা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলো: ওরকম করা ছাড়া আর উপায়ও ছিলো না। ওটুকু দায়িত্ব নিতেই হবে।

অনুভা জান্‌লা থেকে উঠে আয়নার কাছে গেলো। খোঁপাটায় একবার হাত দিয়ে দেখ্‌লো—ঠিক আছে! মুখটায় বেশি পাউডার দেওয়া হয়েছে নাকি?

মুখটা আয়নার আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে অনুভা দেখলো: নাঃ, ঠিক আছে! দু' চোখের ধারে সুর্মার টানও ঠিকই আছে—মোছেনি।

ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনীটা নিয়ে অনুভা তার মাথায় আলগোছে একবার বুলিয়ে নিলো। পরে কাপড়টা আর একটু ভালো ক'রে গুছিয়ে পরে নিয়ে পাশের ইজিচেয়ারে এসে বস্‌লো।

অনুভা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কলেজ থেকে ফিরে এসে,—গা' ধুয়ে, খেয়ে নিয়ে, সেজে গুজে বসে আছে! তা' বসে আছেই বা কেন? ইচ্ছে করলে লেডিজ পার্কে খানিকটা বেড়িয়ে আস্‌তে পারে তো? অন্য দিন তো যায় সে!

আজ সে গেলো না। গেলো না—যদি অমিয় এসে পড়ে। যদি অমিয়র সঙ্গে দেখা না হয়! না, না, তার চাইতে ঘরে বসে থাকাই ভালো। কিন্তু সময় কাটানো তো চাই—অনুভা হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে একখানা উপন্যাস টেনে নিয়ে তার পাতা খুললো। কিন্তু খোলাই সার হোলো। খানিকটা পড়বার পর, এমন একটা সময় এলো, যখন অনুভা একটা লাইন প্রায় পঞ্চাশবার পড়েও তার কোনও মানেই করতে পারলো না। কী ক'রে পারবে? চোখদুটো তার বই-এর উপর থাকলে তো চলে না। মনটা যে তার ছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে অমিয়র পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে।

* * *

অনুভার মন আবার বললো: অমিয়দা আসবে, আসবে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

—তিন—

অনুভা অত আশা করে বসে থাকলে কী হবে—অমিয় সেদিন এলো না। কিন্তু পরদিন তাকে আসতে হোলো অনুভাদের বাড়ীতে।

অমিয়র কাকীমা বললেন: 'যাওতো অমিয় একবার অনুভাদের বাড়ীতে। গিয়ে বলো গে—এবার আমরা আর বাইরে যাবো না। গতবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর না।'

'—ওঁরা বুঝি আবার আমাদের সঙ্গে যেতে চান?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

কাকীমা বললেন: হ্যাঁ। অনুভা কাল এসেছিলো। কিন্তু এবার যাবো কি যাবো না—তোমার কাকার সঙ্গে পরামর্শ না করে তাকে কাল সঠিক বলতে পারিনি।'

যাতে অনুভাদের বাড়ীতে অমিয়র যেতে না হয়—তাই সে বললো:
—'তা আমাদের সাত-তাড়াতাড়ি খবর দেবার কি এমন দরকার?'

—'না, না, তা কি হয়?'—কাকীমা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন: 'অনুভাকে বলে দিয়েছি আজ তার মাকে খবর পাঠাবো। আমরা না গেলে দিদি অন্য কারো সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

আভা এতক্ষণ ঘর থেকে সব শুনছিলো। এবার সময় বুঝে বেরিয়ে এসে বললো: 'কাকীমা, আমি যাব দাদার সঙ্গে অনুদের বাড়ীতে।'

—'অমিয় নিয়ে যেতে চায় তো যাও—।' কাকীমা মত দিলেন।

কাকীমা চলে যেতেই হেসে বললো।

—'চলো, অনুকে বলে আসি—তুমি তাকে এ বাড়ীতে আসতে মানা করেছ।'

—'এ বাড়ীতে নয়—এবাড়ীর একখানি ঘরে।'—অমিয় হেসে শুধ্‌রে দিলো!

—'তোমার লজ্জা করবে না?'—আভা বিস্মিত হোলো।

দ্বিধাহীন অমিয় বললে: 'মোটেই না। যা' সত্যি তা প্রকাশ হ'লে লজ্জা পাবার কোনো কারণ দেখি না; বরং যে বল্‌তে যাবে উল্টে সেই লজ্জা পাবে।'

—'তার মানে লজ্জা পেতে হবে আমাকে? কেন?'

—'পূজনীয় দাদা অপ্রস্তুতে পড়বেন বলে।'

—'ওঃ! ' ঠোট উল্টে আভা বল্‌লো: 'বয়ে গেছে সেজন্যে আমার। দেখো—আমি ঠিক বল্‌বো।'

—'দেখা যাক্!'

আভাকে অনুভাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে অমিয় বল্‌লো: —'আমি একটু ঘুরে আসি। ফেরবার সময় নিয়ে যাবো।'

—'তা' কাকীমা যা বলে দিলেন বল্‌বে না?' আভা দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলো।

অমিয় এড়িয়ে গেল: —'কেন আর আমাকে নিয়ে টানাটানি?' আমার নামে সাতখানা করে লাগাতে পারবে—আর আমার হয়ে এই কথাটুকু বল্‌তে পারবে না যে—আমাদের যাওয়া হবে না?'

আভা হেসে ফেল্‌লো: 'ও সেই ভয়ে পালাচ্ছো বুঝি? তবে যে বললে লজ্জা করবে না?'

—'লজ্জায় নয়—ভয়ে!' অমিয় বললো: 'আজকালকার মেয়েদের মুখ ফোটে না—হাত ছোটে।'

আভা হেসে উঠ্‌লো,: 'বটে?'

অমিয় বিনাবাক্যব্যয়ে সরে পড়লো। একটু পরেই অনুভা এসে দরজা খুল্‌লো:

—'কী রে তুই ? কার সঙ্গে এলি ?'

—'দাদার সঙ্গে।'

—অমিয়দা এলেন না যে ?"

—'কী জানি—কোথায় গেলো যেন !'

অনুভার মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো—'ও।' পরে আভার হাত ধরে বললো : 'আয়, চল্‌ ওপরে যাই।'

* * *

অমিয় ভবানীপুরে সমীরদের বাড়ী গেলো তার খবর নিতে। সমীরের দাদার সঙ্গে দেখা হোলো। খবর পেলো, সমীর আন্দোলনের সময় ধরা পড়ে বাঙলার দু'তিনটে জেলে কিছুদিন করে থাকবার পর এখন তাকে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু খবর পাওয়া যায়। কবে যে তাকে ছাড়া হবে তা তার দাদা বলতে পারলেন না। তবে বললেন : 'যুদ্ধ মেটবার আগে যে ছাড়া পাবে, তা বলে মনে হয় না।' সমীরের মা তার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে প্রথমটা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন বটে, তবে এখন নিজের মনকে অনেকটা বুঝিয়েছেন। তাদের বাড়ীতেও খানাতল্লাসী হয়ে গেছে দু'বার ; তবে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায়নি তাই রক্ষে।

অমিয় সমীরের দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে মনে মনে হাস্‌লো। মনে পড়ে গেল তার—অনুভার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কী ভাবে সাফল্যের সঙ্গে সে তার প্রচারকার্য চালিয়ে গেছে। কেউ ঘুনাক্ষরেও জান্‌তে পারেনি—সন্দেহ করেনি। এমন কী বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত এখনও জানে না। নাঃ, অনুভাকে সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। তার আদেশ সে অম্লান বদনে পালন ক'রে গেছে। কিন্তু—কিন্তু,—অমিয় পরক্ষণেই কঠোর হয়ে উঠলো : অনুভা যে এত করলো—সে তো দেশের জন্যে নয়, তার জন্যে। তার মন রাখতে, তার কথা রাখতে ! ছিঃ !

অমিয় ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জের ট্রামে উঠ্‌লো। ফার্ণ রোডের কাছাকাছি এসে অমিয় ট্রাম থেকে নেমে গেলো। অমিয় ললিতবাবুর বাড়ী যাচ্ছে :

বাড়ীর মধ্যে সোজা ঢুকে গিয়েই গলা ছেড়ে চীৎকার স্থরু করলো :

—'কৈ, মাসীমা কোথায় ? লীনা কৈ ? দেখছি না যে কাউকে ?'

অমিয়র গলার আওয়াজে সারা-বাড়ীটা যেন গম্‌গম্‌ করে উঠ্‌লো। নীচে নেমে এলেন লীনার মা।

—'এই যে অমিয় ! এসেছো—এসো এসো। কেমন আছ তোমরা ?' ভদ্রমহিলার মুখে হাসি।

—'ভালো আছি মাসীমা—' অমিয় পাশের খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো :

—'তারপর ? আপনারা কেমন আছেন বলুন ! মেশোমশায় আপিসে বুঝি ? এবার বাইরে যাবেন না আপনারা ?'

—'না।' লীনার মা বললেন : 'বোমা পড়বার আগে ভাবতাম—বোমা পড়লে বুঝি সারা কলকাতাটাই উড়ে যাবে। সেই ভয়েই তো পালিয়েছিলাম। তা' সত্যিকারের বোমা পড়তে দেখলাম, হাতিবাগানে পড়লে বালিগঞ্জ উড়ে যায় না বা খিদিরপুরে পড়লে শ্যামবাজার উড়ে যায় না। কাজেই মনে সাহস হয়েছে। তাই ভগবানের ওপর ভরসা করে বসে আছি। কথায় বলে না—'রাখে কেষ্ট মারে কে ? মারে কেষ্ট রাখে কে ?'

—'তা' যা' বলেছেন !' অমিয় বললো :

—'আচ্ছা, লীনা কোথায় ? তাকে তো দেখছিনে ?"

—'এই যে লীনা'—লীনা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে বললো : 'কী

সৌভাগ্য ! অমিয়দা তবু আমার খোঁজ নিচ্ছেন ; আরো সৌভাগ্য, অমিয়দা বহুদিন পরে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিলেন—কী বলুন অমিয়দা ? আচ্ছা, মা বলতে পারো—আজ সূর্য কোন্‌দিকে উঠেছিলো ? পূবে না পশ্চিমে ?'

পুরোনো রসিকতা। তবু অমিয় হাস্‌লো। লীনার মাও হাস্‌লেন ; আবার একটু রাগও দেখালেন—যদিও কৃত্রিম :—'জ্যাঠা মেয়ে ! কেন, অমিয় কি কখনো আসেনা আমাদের বাড়ীতে ?'

—'হুঁ, আসি না আমি ? মিথ্যে বলছো !' অমিয় জোর পেয়ে বল্‌লো।

—'বটে ! মিথ্যে বলছি আমি ? অর্থাৎ আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেরিয়েছে বল্‌তে চান ?' লীনা অভিমানের ভাণ করলো : 'বেশ, এ মুখ আর দেখাবো না।'

—'তার মানে ?' অমিয় হেসে জিজ্ঞাসা করলো।

—'দেখবেন 'খন ! এই আমি চললুম।' লীনা উপরে উঠে গেলো।

—'মেয়ের ঢং দ্যাখো ! কী এমন বলেছে তোকে অমিয় ?' মা বল্‌লেন।

মেয়ে ততক্ষণ উপরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

—'লীনা, লীনা'—অমিয় উপরে গিয়ে দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো : 'রাগ করলো ? আমি কী এমন বলেছি তোমায় ? যা' বলেছি ঠাট্টা করে।'

—'এই খুকী, দরজা খোল্।' মা একটু রাগ করলেন বোধহয় : 'মেয়েমানুষের এত রাগ ভালো নয়—'

আরও কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলেন স্টোভ জ্বল্‌বার শব্দ।

স্টোভ ! লীনার মা আর অমিয়র মুখ শুকিয়ে গেলো। আজকালকার মেয়ে ! বিশ্বাস নেই ওদের। অভিমান ভরা মন। একটুতেই একটা যা' তা' কাণ্ড করে বস্‌তে পারে। লেক, দড়ি, কলসী, আফিং, কেরোসিন, স্টোভ—খবরের কাগজের অনেক পুরোনো খবর তাদের দু'জনের মনে নতুন করে দেখা দিলো।

মা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন : 'খুকী' দরজা খোল্ লক্ষীটি।'

—'লীনা, দরজা খোলো লীনা'— অমিয় অনুরোধ করতে লাগ্‌লো।

কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না ; কেবল স্টোভের একঘেয়ে শব্দ।

তাই তো ! কী করা যায় ? আর তো দেরি করা উচিত নয় ! চীৎকার করবে অমিয় ? লোক ডাক্‌বে ? কিন্তু লোকে শুনলেই বা কী বলবে ? লীনার মা দিশেহারা হ'য়ে গেলেন।

—'এক কাজ করা যাক্ না ?' অমিয় বললো : 'দরজাটা ভেঙে ফেলা যাক্। আগে মেয়ে, তারপর দরজা।'

—'সেই ভালো।' লীনার মা যেন অকূলে কূল পেলেন : 'ভেঙে ফেলো দরজা, মারো লাথি।'

—'লাথিতে হবে না মাসীমা।'

—'তবে ?'

—'শাবল নেই ?'

—'শাবল ? আছে বোধহয়, ভাঁড়ার ঘরে দেখছি।' লীনার মা নীচেয়

অমিয় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, আবার জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো :

—'লীনা, খোলো শীগ্‌গীর দরজা। নইলে কিন্তু দরজা ভেঙে ফেল্‌বো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেলো। অমিয় টাল খেয়ে প'ড়ে যেতে যেতে সাম্‌লে নিলো নিজেকে।

—'দরজা ভাঙবার দরকার নেই অমিয়দা'—লীনা দরজার কপাটে হাত রেখে হেসে বললো : 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন। চায়ের জল গরম হয়ে গেছে। চা খেয়ে যাবেন কিন্তু।'

—'চা?' ঘরে ঢুকে চায়ের সরঞ্জাম দেখে অমিয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বল্‌লো :

—'তুমি এতক্ষণ চায়ের জল গরম করছিলে? আমরা ভাবলুম—'

—'বুঝি আত্মহত্যা করছি?' বলেই লীনা হেসে উঠ্‌লো।

এমন সময় লীনার মা এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। হাতে একটা লম্বা শাবল :

—'এই যে! দরজা খুলেছে। কিছু খায় টায় নি তো? হ্যাঁ অমিয়?'

—'না, মা, না—' লীনা শাবল শুদ্ধ তার মাকে জড়িয়ে ধরলো : 'কিছু খাইনি মা। বড়ো ক্ষিদে পেয়েছিলো—'

—'তাই এতক্ষণ স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করা হচ্ছিল'—লীনার কথাটুকু অমিয় শেষ করে দিলো।

—'যাক্! বাঁচা গেলো।' লীনার মা সরল ভাবে একটা বড়ো রকম নিশ্বাস ফেললেন : 'ধন্যি মেয়ে বাবা! মেয়েমানুষের এত বাড় ভালো নয়, খুকী, ভালো নয়। ছি ছি, লোকজন ডাক্‌লে কী কেলেঙ্কারীটাই না হোতো।।ব'লেই এক ঝট্‌কা দিয়ে লীনার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, শাবলটাকে উঁচু করে বললেন :

—'ইচ্ছে হচ্ছে দিই এই শাবলটা বসিয়ে তোর মাথায়!'

—'তাই দাও মা, তাই দাও'—লীনা হেসে বল্‌লো : 'এতো কষ্ট ক'রে শাবলটা আনলে নীচের থেকে—কোনো কাজেই লাগবে না?'

—'তা দিলে হয়।' অমিয় যোগ দিলো : 'দরজা ভাঙার

চাইতে মাথা ভাঙা ঢের সহজ। এক ঘা-তেই সব শেষ হয়। তবে কিনা—'

—'না মা, পুলিশের ভয় কোরো না। দাও ঐ শাবল বসিয়ে এই মাথায়; তোমার দুষ্টু লীনা মরে যাক্। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাও, শান্তিতে তোমার বাকি দিনগুলো কাটুক।' বলেই লীনা আবার তার মাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

একথা শুনে কোন্ মা আর রেগে থাকতে পারেন? লীনার মা শুধু বললেন: 'ছাড়, ছাড়্! চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। অমিয়কে চা করে দে, তুই খা। আমি দেখি অমূল্য কোথায় গেলো; একটু খাবার আন্‌তে বলি।'

শাবল নিয়ে লীনার মা নীচেয় নেমে গেলেন।

লীনা চা তৈরি করতে করতে বল্‌লো: 'আজ আমি চা খাবো না ভেবেছিলুম, কিন্তু খেতে হবে।'

—'কেন?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

—'আপনি আমায় মিথ্যেবাদী বলেছেন।'

—'সেজন্যে চা খেতে হবে?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'তোমার এ অদ্ভুত কথার কোনো মানে হয় না।'

—'তবে শুনুন, মানে বুঝিয়ে দিই'—লীনা বললো: 'আজকালকার মেয়ে-পুরুষ কিসের ভক্ত?'

—'সিনেমার ভক্ত বলেই তো মনে হয়।'

—'আর কিসের বলুন তো?'

—'জানিনে। তুমি বলো।'

—'বলুন তো গঙ্গাজলের উপর তাদের ভক্তি আছে?'

—'না।'

—'চা-কে তারা ভক্তি করে, মানেন তো?'

—'মানি।'

—'তাই ঠিক করেছি'— লীনা এককাপ চা অমিয়র দিকে এগিয়ে নিয়ে নিজে এককাপ হাতে নিয়ে বললো:—'এই মিথ্যেকথা-বলা মুখটাকে চা দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ করবো।'

বলেই লীনা একচুমুক চা খেয়ে নিলো। লীনার কাণ্ড দেখে অমিয় হো হো করে হেসে উঠলো।

—চার—

বাড়ী ফেরবার পথে অমিয়কে আবার যেতে হোলো অনুভাদের বাড়ীতে। আভাকে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই যেতে হোলো বাড়ীর ভেতরে; দেখা হোলো অনুভার সঙ্গে, তার মায়ের সঙ্গে। আগের মতোই অমিয় দিব্যি কথা বল্‌লো, হাস্‌লো, জিজ্ঞেস কর্‌লো : কে কেমন আছেন ও আছে।

অনুভার চাইতে, অনুভার মায়ের সঙ্গেই বেশি কথা বললো অমিয়। অযথা কথা :

—'আপনাদের পর্দার জান্‌লার কাপড়টি তো বেশ। এ সময় কোথায় পেলেন মাসীমা, কতো ক'রে গজ?...আজ বড়ো গরম।...আপনি আমাদের বাড়ী যান না?·· ভুলে গেছেন আমাদের?

আলোচনায় খানিকটা সময় কাট্‌লো। তারপরেই আবার অমিয়কে জিজ্ঞাসা করতে হোলো সেই মামুলি প্রশ্ন :

—'তারপর কেমন আছেন বলুন?'

—'সে কথা তো এসেই জিজ্ঞাসা করেছেন আবার কেন?' অনুভা হেসে বললো।

—'তাই নাকি?' অমিয়ও হাস্‌লো।

—'তাই তো মনে হচ্ছে। আর কথা পাচ্ছেন না বুঝি খুঁজে?' অনুভা বড়ো চালাক।

—'হয়তো পাচ্ছি না। তুমি যখন বলছো! কী বলুন মাসীমা?'— অমিয় অনুভার মাকে মধ্যস্থ মান্‌লো : 'আচ্ছা, আসি তা' হোলে মাসীমা!' অমিয় যাওয়ার উদ্যোগ করলো।

—'এরি মধ্যে? বসুন একটু।' অনুভা বললো।

—'একটু চা-টা খাও।' অনুভার মা বললেন।

—'আমি এইমাত্র চা' খেয়ে আস্‌ছি।' অমিয় যাওয়ার জোগাড় করলো :

—'কৈ, আভা চলো, যাই এবার। আচ্ছা, মাসীমা আসি তা' হোলে। যাবেন একদিন আমাদের বাড়ীতে। আসি তা হোলে অনুভা।'

* * *

অনুভা একটা কথাও বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখ্‌লো ; দেখ্‌লো অমিয়র ব্যবহারটা। কেন ? এত অবহেলা কেন ? অমিয়র এমন কী আছে, আর এমন কী নেই অনুভার—যার জোরে সে অপমান, হ্যাঁ, অপমান করে গেল অনুভার মতো মেয়েকে ?

অভিমানে ভ'রে উঠলো অনুভা : কী নেই তার ? দুধে-আলতা রঙ নেই বটে, তবে শ্রী আছে, লাবণ্য আছে—যৌবন আছে তার সারা দেহ ঘিরে। শিক্ষিতা সে : বাড়ীতে টেলিগ্রাম এলেই কেঁদে ফেলে না ; প'ড়ে বুঝতে পারে ব্যাপারখানা কী ? তারপর চালচলন, আদব-কায়দা সবই তার দুরস্ত। পুরুষ মানুষ দেখলেই তার মুখ লাল হয়ে ওঠে না ; একলা বাসে কিম্বা ট্রামে সারা কলকাতাটাই ঘুরে আস্‌তে পারে। নাচতে জানে না বটে, গাইতে পারে সে। গলা ভালো—অনেকে বলেছেন। রেডিয়োতে প্রায় তার গান শোনা যায় ; রেকর্ডেও শীগ্রী গান দেবে। এমব্রয়ডারীতে হাত পাকা। এই তো, গত বছর "ভবানীপুর শিল্প-প্রদর্শনী"তে হাতে কাজ-করা ময়ূরের ছবি দেখিয়ে একটা রূপোর মেডেল নিয়ে এলো !

আর কী চায়—কী চায় অমিয় ? আজকালকার ছেলে, আজকালকার মেয়ের কাছ থেকে যা' আশা করে, যা' পেতে চায়—সবই তো আছে অনুভার ! তবু অমিয় অনুভাকে অবহেলা করলো ; অবহেলা নয়—অপমান করলো। অভিমানে অনুভার দু'চোখ দিয়ে জল পড়লো ঝ'রে।

* * *

চোখের জলে ধুয়ে গেলো অভিমান, অপমানের ব্যথা। মনের ঝড় থামলো শেষে। শান্ত হোলো, স্থির হোলো অনুভা। মনে হোলো তার : আমার কী আছে, কী আছে আমার ? কী দিতে পারি—কী পেতে পারে অমিয়দা আমার কাছে—যা দিয়ে তাকে আমি আমার করতে পারি ? আমি কি তার যোগ্য ?

এমন সময়, রাত্রি তখন প্রায় ন'টা, করুণস্বরে কেঁদে উঠ্‌লো সাইরেন। যন্ত্রদানবের সেই ভয়-পাওয়ানো চাপা কান্নার ঢেউ সকলের প্রাণে এসে দমকে দমকে আঘাত করতে লাগ্‌লো। সে কান্না শুনে—অনুভার কান্না গেলো থেমে। মনে মনে বললো : 'হে ঈশ্বর! যেন অমিয়দা'দের কোনো বিপদ না হয়!'

খানিক পরে একঘেয়ে সাইরেনের শব্দ জানিয়ে দিলো—সব বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু অনুভার মন উতলা হয়ে রইলো। অমিয়দা'রা নিরাপদে বাড়ী পৌঁচেছে কি ? কে জানে ?

তাই সেদিন যখন অনুভার মা বললেন : 'চল্ অনু, ঘুরে আসি অমিয়দের বাড়ী থেকে। অনেকদিন দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি।'—অনুভা আপত্তি করলো না। চললো মায়ের সঙ্গে।

* * *

তখন সন্ধ্যা প্রায় হ'য়ে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ লাল—সিঁদুর মাখানো। ছেলেমেয়েরা ঝি-চাকরের হাত ধরে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছে। মই কাঁধে ক'রে কর্পোরেশনের লোক গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো।

অনুভারা অমিয়দের বাড়ীতে এসে পৌঁছুলো। বাড়ীর ভিতরে যেতেই অমিয়র কাকীমা ছুটে এলেন : 'আসুন দিদি—কী সৌভাগ্য! এসো অনুভা, তোমার বন্ধু তো গেছে ওঁর সঙ্গে কলেজস্ট্রীটে জামা-কাপড় কিনতে।'

—'বেশ মেয়ে তো! আমি এলাম অথচ দেখা হোলো না?'—অনুভা জিজ্ঞেস করলো: 'তা, আপনি গেলেন না যে?'

—'না, মা! আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।'

—'অমিয় কোথায়?'—অনুভার মা খোঁজ নিলেন।

অনুভাও মনে মনে এই প্রশ্নই করছিলো।

অমিয়র কাকীমা বললেন: 'উপরে তার পড়বার ঘরে।'

—'এই সন্ধ্যাবেলায় পড়ার ঘরে? কী করছেন সেখানে?'—অনুভা জিজ্ঞেস করলো।

—'কী জানি মা!' কাকীমা বললেন।

—'আচ্ছা, আমি দেখে আসছি।'—ব'লেই অনুভা সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। এই সুযোগটুকুই খুঁজছিলো সে।

অনুভা উপরে গেলো।

অমিয়র পড়বার ঘরের দরজা খোলা। অনুভা দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। অমিয় দেখতে পায়নি। আধো-অন্ধকার ঘরে দিনের আলো নেই বললেই হয়। অমিয় জানলার কাছে একটা ইজিচেয়ারে বসে কী যেন একখানা বই পড়ছে একমনে। পাশের ছোট গোল-টেবিলের উপরে আরো প্রায় খান পনেরো-কুড়ি বই জড়ো করা। মেঝেতে তিনচারখানা সচিত্র পত্রিকা প'ড়ে আছে।

অনুভা দেখলো, অমিয়র মাথা নীচু হ'য়ে থাকায় কোঁকড়ানো চুলের একগোছা ঝুলে রয়েছে। কালো শেলের চশমাটাও যেন একটু ঝুলে আছে মনে হোলো। গায়ে তার হাতকাটা গেঞ্জী।

অনুভা খানিকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে। একমনে দেখতে লাগলো অমিয়র বইএর-দিকে-চেয়ে-থাকা ধ্যানস্থ মূর্তি! কোনো দিকে লক্ষ্য নেই—ধীর, স্থির হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে অমিয় পড়েই চলেছে। অনুভা বুঝলো—অমিয় তাকে দেখতে পায়নি।

কাজেই তাকে বলতে হোলো : 'ওটা কী বই ?'

অমিয় চম্‌কে মুখ তুলে চেয়ে দেখলো অনুভা। অনুভা হেসে বললো :
—'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—চোখ তুলে দেখলোও না কেউ !'
—'বইটা পড়ছিলাম কিনা—তাই অতটা খেয়াল হয়নি।'—অমিয় অসঙ্কোচে কথাটা বললো।

অনুভা আবার হেসে বললো : 'অসময়ে এসে খুব বিরক্ত করলাম—না ?'

—'তা অসময়ই তো !'

—'তবে চলে যাবো !'

—'সেটা তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে।'

—'আমি এসেছিলাম—' অনুভার হাসি মিলিয়ে গেছে : 'আমি এসেছিলাম—তুমি, আভা সেদিন নিরাপদে বাড়ী ফিরেছিলে কিনা জান্‌তে। পথে সাইরেন বেজেছিলো নিশ্চয়ই—'

—'বেজেছিলো। তবে নিরাপদে যে ফিরেছি—তা দেখেই বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।'

অনুভা এবার একটু যেন রাগ করলো : 'তা, জিজ্ঞেস করাটা কি অন্যায় হয়েছে ? কেন, আমি কী এমন অন্যায় করেছি তোমার কাছে যে, এতো অবহেলা ! লোকের বাড়ীতে এলে কি ভদ্রতার খাতিরে বস্‌তে বলতেও নেই ?'

—'ঘরে এই ইজিচেয়ারটা ছাড়া আর বসবার কিছু নেই বলেই বস্‌তে বলিনি।' অমিয় ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : 'তা, তুমি না হয় বোসো এই চেয়ারে—আমি এই উঠলাম।'

—'যেচে মান চাইনে আমি।'—অনুভা জোর গলায় বললো।

—'কেউ চায়, তা আমিও চাইনে।' অমিয় বললো : 'আরো একটা কারণে তোমাকে এঘরে ঢুকতে বলিনি।'

'—জান্‌তে পারি কি ?'—বাঁকা হেসে অনুভা জিজ্ঞেস করলো।

'কেন, আভা তোমায় বলেনি ?'

এবার একটু আশ্চর্য হোলো অনুভা : 'না তো !'

অমিয় মৃদু হেসে বললো : 'বেচারী লজ্জায় বলতে পারেনি। অথচ আমায় কত ভয়ই না দেখালো ! যাক আমিই বলি,—আমি তার বান্ধবীদের আমার এই ঘরে আনতে মানা করে দিয়েছি।'

—'কেন ?'—ঠাট্টার সুরে অনুভা বললো : 'তার কোনো বান্ধবী তোমার কিছু চুরি করেছিলো বুঝি ?'

—'চুরি করেনি বটে। তবে তার কোনও বান্ধবী আমার এঘরে আসে—আমি তা পছন্দ করিনে।'

অমিয় বইখানা মুড়ে টেবিলে রেখে টেবিলের এক ধারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

দারুণ রাগে, দুঃখে, অভিমানে, অপমানে অনুভার মাথা ঘুরতে লাগলো। দরজার ডান দিকের চৌকাঠখানা হাত দিয়ে চেপে ধ'রে, নিজেকে অতিকষ্টে সংযত ক'রে বললো : 'মা এসেছেন, এখুনি চলে যেতে হবে ; একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?'

—'পারো।'—অনুমতি দিলো অমিয়।

—'তোমায় আমি একখানা—'

—'হ্যাঁ, সে চিঠি আমি পেয়েছি।'

—'কোথায় সে চিঠি ?'

—'পুড়িয়ে ফেলেছি।'—অমিয় সোজা হয়ে দাঁড়ালো : 'আমি চাইনে তোমার মতো একটি অবিবাহিতা মেয়ে আমার মতো একটি অবিবাহিত ছেলেকে চিঠি লেখে ; বিশেষ করে ঐ ধরণের চিঠি। উপন্যাসে পড়তে পারো, ছেলেরা মেয়েদের চিঠি পেলে হাতে স্বর্গ পায় ; কিন্তু জেনে রেখো, সব সময় তা' নয়।'

—'তবে তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে!' অনুভা ঠোঁট বেঁকিয়ে অদ্ভুত ভাবে বল্‌লো।

'নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে।' অমিয় টেবিল চাপড়ে বল্‌লো : 'একশোবার অন্যায় হয়েছে। যে মেয়ে বিয়ের আগে একটা ছেলেকে প্রেমপত্র লিখতে পারে, সে যে বিয়ের পরেও আর একটি ছেলেকে লিখবে না তার নিশ্চয়তা কৈ?'

—'তার মানে?'

—'তার মানে তুমিই বোঝো ভালো।···যাই নীচেয় মাসীমা বসে আছেন।'

অমিয় আর দাঁড়ালো না সেখানে। নীচেয় নেমে এসে অমিয় পাকা অভিনেতার মতো হাব-ভাব-স্বর বদ্‌লে বল্‌লো : 'এই যে, মাসীমা এসেছেন। কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! তারপর, কেমন আছেন বলুন? ভালো তো? যাক্‌, আমি তো ভেবেছিলাম—এ বাড়ীতে আসবার পথ বুঝি ভুলে গেছেন—'

এমন সময় অমিয় দেখতে পেলো—অনুভা সিঁড়ি দিয়ে অতি ধীরে ধীরে নামছে; 'হয়তো ভুলে গেছলেন, তাই সঙ্গে অনুভাকে নিয়ে এসেছেন।' বলেই লাফিয়ে উঠলো :—'ঐ যাঃ! অনুভার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে ভুলে গেছি তো! ৬টার সময় যে আমার একটা দরকারী মিটিংএ যাওয়ার কথা ছিলো। কী করা যায়? মাসীমা এলেন অথচ একটু গল্প করা যাবে না? কী দুর্ভাগ্য! কিছু মনে করবেন না মাসীমা,—আমি আসি; আর সময় নেই। আসি অনুভা—।'

—'এসো, কাজ আছে যখন।' মাসীমা বল্‌লেন।

—'হ্যাঁ মাসীমা, বিশেষ দরকারী কাজ এটা; মনে কিছু করবেন না।'

বলেই অমিয় অনুভার পাশ কাটিয়ে উপরে চলে গেল আবার।

* * *

পাঞ্জাবীর বোতামগুলো লাগানো হয়নি, চুলগুলো এলোমেলোই র'য়ে গেছে,—অমিয় এমনভাবে বাড়ীর থেকে বেরুলো—যেন মস্ত বড়ো কাজ করতে যাচ্ছে সে। ভাবটা: সব মাটি হয়ে যাবে, সে যদি না যায়।

সশব্দে সে সিঁড়ি দিয়ে নামলো। নীচের ঘরের দরজার কাছে ক্ষণেকের জন্মে দাঁড়ালো: 'আসি তাহ'লে মাসীমা—' ব্যাস, আর তাকে দেখা গেলো না। যখন দেখা গেলো তখন অমিয় এসপ্ল্যানেডে বাস থেকে নামছে। নেমেই কার্জন পার্কে ঢুকলো। পথে একটা চীনাবাদামওয়ালা বসে ছিলো। কিনলো দু'পয়সার চীনাবাদাম। শেষে আমাদের অবাক ক'রে অমিয় পরম নিশ্চিন্তে পার্কের একটি বেঞ্চে ব'সে চীনাবাদাম খেতে লাগলো।

—'অমিয় য! মানে তুমি এখানে?'

অমিয়র সামনে ললিতবাবু এসে দাঁড়ালেন। অমিয় বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ললিতবাবু আফিস ফেরৎ বাড়ী যাচ্ছিলেন। পরণে ট্রাউজার, গায়ে গলাবন্ধ কোট। হাতে ছাতা। নাকের ডগায় রূপোর চশমা। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'কী খাচ্ছো? চীনাবাদাম? পেট কামড়াবে যে! মানে ওসব খারাপ।'

—'না মেশোমশায়, সে ভয় নেই।' অমিয় হেসে উঠে দাঁড়ালো: 'বেশি নয়, মাত্র দু'পয়সার কিনেছি।'

—'তার মানে?' ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক হ'য়ে গেলেন: 'দু'পয়সার চীনাবাদাম খেতে পাঁচ পয়সার বাস খরচ করে এখানে এসেছো? না, না, অমিয়, এর কোনো মানে হয় না।'

অমিয় হো হো করে হেসে উঠলো: 'আমি এখানে চীনাবাদাম খেতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি।'

—'বেড়াতে এসেছো? তবে বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকবার মানে?'

—'ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কিনা !'

—'ক্লান্ত ?' ললিতবাবু আবার সুরু করলেন : 'এই বয়সে একটুতেই ক্লান্ত হবার মানে ? দেখো দিকিনি, আমরা এখনও এত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও সহজে ক্লান্ত হইনে। মানে, আজকালকার ছেলেদের এসব কথার কোনো মানে হয় না।'

—'সে তো হয়ই না।' অমিয় ললিতবাবুর মতে মত দিলো : 'আজ-কালকার হাড় ডিগ্ ডিগে চোখে-চশমা ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের তুলনা ? কী যে বলেন ?'

—'এর মানে আছে অমিয়—এর মানে আছে।' ললিতবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন।

—'কী বলুন তো ?'

—'মানে আজকালকার ছেলেরা খায় কী বলো ? যুদ্ধের বাজারে জোলো দুধ, ভেজাল তেল, আটা—এই তো ? মানে আমাদের সময়ের মতো ঘি-দুধ কি জোটে এদের ?'

—'সত্যিই তাই !' অমিয় সায় দিলো। তবু বলতে ছাড়লো না : 'কিন্তু দেখেছেন—আজকালকার ছেলেমেয়েদের দেহের জোর নেই বটে, কিন্তু মনের জোর বেড়ে গেছে খুব।'

—'তার মানে ?'

—'দেখেন না—পুলিশকে আজকাল এরা কেয়ারই করে না। বন্দুকের সামনে বুক পেতে দাঁড়ায়। দেখলেন তা ডাকঘর পুড়িয়ে, স্টেশন পুড়িয়ে কী কাণ্ডটাই না করলো !'

—'ঠিক বলেছো অমিয়, ঠিক বলেছো ! মানে, তুমি ও-সবের মধ্যে নেই বলেই তো তোমাকে এতো পছন্দ করি।···ভালো কথা, তোমার কাকা কাকীমা—তারপর তোমার বোন—মানে, কি নাম যেন—?'

—'আভা।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আভা। মানে, সব ভালো আছেন তো ?'

—'হ্যাঁ, ভালো আছেন। আপনারা সব ভালো তো ?'

—'মানে এই একরকম কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা, একদিন সবাই এসো। আমি যাই, মানে আবার বাস-ট্রাম সব একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। মানে, যত সব দিনকে-দিন কাণ্ডকারখানা হচ্ছে ভালো। ব্ল্যাক-আউট, ব্ল্যাকমার্কেটের মানে আগে জান্‌তামই না—এই মরবার আগে জান্‌লাম। ...আচ্ছা—বাবা অমিয়, মানে, আসি আজ।'

ললিতবাবু চলে গেলেন। অমিয় কোনো বাসে বা ট্রামে না উঠে ইচ্ছে করে দেরিতে বাড়ী ফেরবার জন্যে, হেঁটে হেঁটে বাড়ীর দিকে চল্‌লো।

—পাঁচ—

"হ্যাপি হোম।" একটি মেসের নাম। বহুদিনের মেস। কাজেই বুঝি বাড়ীটাও বহু পুরোনো। চৌকিতে ছারপোকা। টেবিলের পায়াগুলো নড়বড়ে। ভাতে কাঁকর। জোলো ডালে ঠাকুরের ঘাম। বাসিন্দারা সবাই প্রায় চাকরে, মেসে থাকে খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে। বাইরে বেরোয় যখন তখন বেশ ফুলবাবুটি!

এ হেন "হ্যাপি হোমের" একটি ঘরে চৌকিতে শুয়ে নিশীথ দুপুর-বেলায় কবিতা লিখছিলো :

ছাদের উপর
চুল শুকোচ্ছে মেয়ে।
পীচের মতো কালো চুল,
মেঘের মতো ঘন চুল—
শুকোচ্ছে মেয়ে॥
রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি আমি।
চুলের গন্ধ পচ্ছি না তো
পাচ্ছি না তো
তবে হ্যাঁ, পাওয়া যেতো
আসতো যদি কাছে।

—'হ্যালো নিশীথ, শুয়ে প'ড়ে কী লিখছিস ?'

নিশীথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো মোহন। উঠে বসে বললো :

—'কবিতা লিখছি।'

—'কবিতা ?' মোহন অবাক হয়ে গেল : 'তুই তো কখনো কবিতা লিখতিস্ না ?'

—'তখন লিখতুম না কবিতায় মিল করতে হোতো বলে।' নিশীথ মোহনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লো : 'বোস্‌ বোস্‌ মোহন। জানিস্‌ তো, আগে 'চুল'-এর মিল করতে হোতো, 'ফুল' দিয়ে, 'দুল' দিয়ে, 'ভুল' দিয়ে। আর এখন? 'চুল' এর মিল তুমি 'মেয়ে' দিয়ে করতে পারো, 'পুরুষ' দিয়ে করতে পারো, এমন কি 'ব্যাং' দিয়ে পর্যন্ত করতে পারো! তারপর উপমা? যে কোনো উপমা দিতে পারো—'পীচ'-এর, 'তিমি মাছের' 'হিল-উঁচু' জুতোর, 'সিগ্রেটের ধোঁয়ার'—যা খুশী। কত সহজ এখন কবিতা লেখা! এখন লিখ্‌বো না?'

—'দেখি, কী লিখ্‌লি?'

নিশীথ মোহনের হাতে কাগজের টুকরোটা দিয়ে বল্‌লো :

—'ত্যাখ্‌ আমার কবিতা, আধুনিক কবিতা। এটুকু লিখতে আমার দু'মিনিট লেগেছে।

মোহন পড়তে লাগ্‌লো। এমন সময় ঘরে ঢুক্‌লো লুঙ্গির মতো ক'রে কাপড় পরা, চশমা চোখে এক ভদ্রলোক। নিশীথের পাশের ঘরে থাকেন। ভদ্রলোকের হাতে একটি মেয়েদের চুল বাঁধবার ঝুম্‌কো।

—'এটি আপনি আমার ঘরে ফেলে এসেছিলেন।' ভদ্রলোক নিশীথকে ঝুম্‌কোটা দেখিয়ে মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন।

—'তাই ওটা পাচ্ছিলুম না।' নিশীথ ঝুম্‌কোটা ভদ্রলোকের হাত থেকে নিয়ে নিলো : 'অশেষ ধন্যবাদ, মানিক বাবু। পকেটটা ছেঁড়া ছিলো কিনা। কখন পড়ে গেছে বুঝ্‌তে পারিনি।'

—'বিয়ে করিসনি, ঝুম্‌কো কেন?' মোহন বল্‌লো।

—'বোনের জন্যে হয়তো।' মানিকবাবু হেসে বললেন।

—'মশাই, বোন-টোন ওর নেই কোনো কালেই।' মোহন উত্তর দিলো।

—'কেন ?' পাতানো বোন থাকতে পারে না ? পাড়াতুতো ?' নিশীথ গম্ভীর হয়ে বললো : 'শোন তবে, বসুন ললিতবাবু, বল্‌ছি শুনুন : এটি এখন আমার ; ছিলো একটি মেয়ের। নাম ললিতা। পাড়ায় থাক্‌তো। যেতুম তাদের বাড়ী। আলাপ হয়েছিলো, দাদা বল্‌তো। পরে যখন বিয়ের ঠিক হোলো সে আমায় ডেকে নিয়ে তার চুল থেকে খুলে দিলো এই ঝুম্‌কো। বললো : 'মনে রেখো।'

—'বাঃ, এ যে দেখ্‌ছি রীতিমতো প্রেম !' মোহন বললো।

—'তাইতো দেখ্‌ছি !' মানিকবাবু যোগ দিলেন।

—'যখন আরম্ভই হোলো, বলি তবে।' নিশীথ মনিব্যাগ থেকে একটা সেফ্‌টিপিন বার করে বললো : 'এটা একটা সেফ্‌টিপিন।'

—'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' মোহন বললো।

—'এটিও একটি মেয়ের। নাম কাকলি। বয়েস পনেরো হবে। এসেছিলো স্বদেশী একজিবিশন দেখ্‌তে। ভীড়ের ভিতর সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলে এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। কাছে গিয়ে নামধাম জিজ্ঞেস করলুম ; পৌঁছে দিয়ে এলুম তার বাড়ীতে। সেই থেকে ভাব। তাদের বাড়ীতে আমার ছিলো অবাধ যাতায়াত।···তারপর একদিন শুনলুম, সে দেশে যাবে। গিয়ে বললুম : 'তোমার স্মৃতিচিহ্ন কিছু দাও ?' দিলো খামে মুড়ে এই সেফ্‌টিপিন। আর একটুক্‌রো চিঠি : 'যে ব্যথা আজ বুকে নিয়ে যাচ্ছি তারই প্রতীক এই সেফ্‌টিপিন।'

—'তার মানে ?' মানিকবাবু বল্‌লেন।

—'তার মানে বুকে পিন্ বেঁধালে যেমন ব্যথা লাগে, তেমনি ব্যথা নিয়ে মেয়েটি নিশীথকে ছেড়ে গেছে।—কী বলো নিশীথ, তাইতো ?' মোহন নিশীথের দিকে চেয়ে হাস্‌লো।

—'বোধহয় তাই।' নিশীথ বললো : 'এমন ছোটখাট জিনিষ আমার কাছে অনেক আছে। ঐ যে দোয়াতদানী,—ওটা আর একটি মেয়ের

দেওয়া। নাম রেবা। হ্যাঙ্গারটি 'পুষ্প'র দেওয়া। রুমাল তো কিনতেই হয় না। তা ছাড়া এই আংটি : এতে 'N' লেখা আমার নাম নয়—এটি একটি মেয়ের নাম। সেই দিয়েছে আমাকে। নাম তার নীলিমা।

—'বাঃ, বেশ আছিস্ তো নিশীথ!' মোহন বল্‌লো।

—'তাই তো দেখছি মশাই।' মানিকবাবু বল্‌লেন : 'আমার ধারণা ছিলো মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে গেলে তাদেরই কিছু দিতে হয়। এ দেখ্‌ছি উল্টো।'

—'উল্টো নয়, মানিকবাবু, উল্টো নয়।' নিশীথ বল্‌লো : "যারা বোকা, তারাই মেয়েদের উপহার দেবার জন্যে, বাপমায়ের বাক্স ভাঙে। একটু কায়দা করে চল্‌লে দেখ্‌বেন মেয়েরাই আপনার জন্যে মায়ের আঁচল থেকে চাবি চুরি করে পয়সা বার করবে; চাকরি করলে, অর্দ্ধেক মাইনে খরচ করবে আপনাকে খুসী করতে। ...এই আমার শনিবার-রবিবার রেষ্টুরেণ্ট বাঁধা,—পয়সা যোগায় কে? আমারই এক লেডী-ফ্রেণ্ড—'স্মৃতি।' আমি তার সঙ্গে যাই—সঙ্গে খাই—গল্প করি তার সঙ্গে—ব্যস্!"

—'আমাদের ও রকম দু'চারটে লেডী-ফ্রেণ্ড জোটে না? হায় ভগবান!' মোহন দুঃখ করলো।

—'যা বলেছেন!' মানিকবাবু সায় দিলেন।

নিশীথ তাদের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্‌তে লাগলো : 'সেদিন বন্ধুর বাড়ীতে নেমতন্নে গেছলুম। তুই বোধহয় চিনিস্ তাকে, মোহন।'

—'কে বল্ তো?'

—'অরুণ রে অরুণ!' নিশীথ বললো : 'শ্যামবাজারে থাকে—কিছুদিন হোলো তার বোনের বিয়েতে আলাপ হোলো একটি মেয়ের সঙ্গে।'

—'কেমন দেখ্‌তে?' মোহন বল্‌লো।

—'দেখতে মেয়ের মতোই।' নিশীথ কথায় রস মেশালো : 'অতি সাধারণ দেখ্‌তে কিন্তু অসাধারণ হতে চায়।'

—'বুঝলুম না ঠিক।' মানিকবাবু বললেন।

—'মানে, পিতলকে ঘসে মেজে সোনা বলে চালাতে চায়। আরো স্পষ্ট করে বলি।' নিশীথ বললো: 'সে মেয়ে মুখে পাউডার ঘসে ঘন-ঘন, ঠোঁটে লাগায় লিপস্টিক, ভুরুতে কালি ঘসে, চোখে লাগায় সুর্‌মা। পেঁচিয়ে কাপড় পরে—তবু যেন এলোমেলো। চুল বাঁধে এলো করে—কানে ঝোলায় চাকা—'

—'চাকা!' মানিকবাবু অবাক হলেন।

—'ঐ হোলো—চাকা নয় কানবালা। গুণ না দেখিয়ে রূপ দেখাতেই ব্যস্ত। নিজের চাইতে নিজেকে বড়ো করে দেখানোই তার পরম লক্ষ্য। চায়—সবাই তাকে দেখুক।'

—'এমন মেয়ে!' মোহন বললো।

—'হ্যাঁ!'

—'কী ক'রে আলাপ হোলো?'

—'অরুণ করিয়ে দিলো। তারপর করে নিতে হোলো।'

—'কী আদায় করলি?'

—'বেশি কিছু নয়। দু'খানা সিনেমার টিকিট। টাকা দিলো বান্ধবী—কিনে আনলুম আমি। আজকের ছটার শো'তে 'চিত্রায়'।

—'মিলন' দেখতে বুঝি? তার বাপ-মা ছেড়ে দেবে একলা তাকে?'

নিশীথ হাসলো: 'একলা কোথায়? আমি তো সঙ্গে যাবো। ভাবিস্‌নে, মেয়েরা চালাক বেশি। অভিসারে তারাই যায়। বাপ-মাকে সে জানতে দেবে? কথখনো না। বেরুবার সময় হয়তো বলবে: আমাদের স্কুলের একটি মেয়ের কাছে যাচ্ছি মা, অঙ্কের বইটা আনতে। ফিরে গিয়ে বলবে: বড্ড দেরি হয়ে গেলো। কী করবো—না খাইয়ে ছাড়লো না যে! ওদের দরোয়ান পৌঁছে দিয়ে গেলো গলির মোড় পর্যন্ত। ব্যস্‌, আর না—' নিশীথ বললো: 'প্রেমোপাখ্যান এখন চাপা থাক্—

এখন একটু চা-টা খাওয়া যাক্; আবার ছ'টার আগে বেরুতে হবে।'

*   *   *

মেস্ থেকে বেরুবার সময় মোহন নিশীথকে বললো: 'তোর নতুন বান্ধবীর গল্প শুনে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

—'তা, চল্ না সিনেমায়,—আমাদের 'মিলন' দেখবি। পয়সা লাগবে না।' নিশীথ হাস্‌লো।

—'আজ না ভাই।' মোহন বল্‌লো: 'আজ দিদির বাড়ী যেতে হবে—নেমতন্ন।'

এমন সময় শ্যামবাজারের বাস এসে পড়লো।

—'গুড্-বাই!' নিশীথ লাফিয়ে উঠলো বাসে: 'আসিস্ আবার মোহন।'

—'ভালো কথা—' মোহন বল্‌লো: 'মেয়েটির নাম বল্‌লি না তো?'

পা-দানির ওপর দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে নিশীথ বল্‌লো: 'অনুভা!'

— ছয় —

নিশীথ যখন 'চিত্রায়' এসে পৌছলো, অনুভা তখনো আসেনি। একটু পরেই এলো। খুব সেজেছে। নিশীথকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে হেসে বললো : 'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি—কী বলুন ?'

—'আমিও তো এলুম এই।' নিশীথ বললো : 'আসুন ভিতরে যাই।'

হলে ঢুকে পিছনে এক কোণে দু'জনে বস্‌লো। অনুভা বল্‌লো : 'আচ্ছা, বলুন তো!'

নিশীথ চুপ করে থাক্‌লো।

—'শুন্‌ছেন ?' অনুভা আবার বল্‌লো।

—'আমাকে বল্‌ছেন ?' নিশীথ জিজ্ঞাসা করলো।

—'তাই ব'লে তো মনে হচ্ছে। অনুভা জিজ্ঞাসা করলো : 'আপনি কি ভেবেছিলেন, ঐ টাক-মাথা ভদ্রলোককে বলছিলুম ?'

—'না, আমি ভাবছিলুম, আপনি তো আমার নাম জানেন—'

—'ও, এই জন্যে এতো রাগ!' অনুভা হাসলো : 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

—'করুন।'

—'আপনি দয়া করে আমাকে "আপনি" বলা ছাড়বেন কি না ?'

—'ছাড়তে পারি যদি তুমিও ছাড়ো।' নিশীথ বল্‌লো : 'আর যদি তুমি আমায় ওরকম নাম-হীন না করো। জেনে রাখো : আমারও একটা বাপ-মায়ের দেওয়া নাম আছে।—এ চা, ইধার আও।'

চা-ওয়ালা এলো।

—'একটু চা খাওয়া যাক্‌—কি বলো অনুভা ?' চা-ওয়ালাকে বললো : —'এই দো' কাপ চা দেও—আউর দোঠো কেক্‌।'

দাম দেবার সময় নিশীথ পকেটে হাত দিলো। অনুভা দেখতে পেয়ে বলে উঠ্‌লো: 'না নিশীথদা, ওটি হবে না, আমিই আজ সব খরচ করবো।'

—'তোমার খুব পয়সা হয়েছে বুঝি? চাকরি করছো?' নিশীথ হাসলো।

—'আমি না, বাবা বেঁচে থাকৃতে চাকরি করতেন।'

—'আর তুমি তাঁর কষ্টের পয়সা আমার মতো অকর্মণ্যের জন্যে খরচ করছো? না অনুভা,—আমি পয়সা দিই।'

—'আমি কিন্তু রাগ করবো তা হোলে?'

—'এর উপর আর কিছু বলা চলে না।' নিশীথ বল্‌লো।

—'কিছু বলবার দরকারও নেই, ধন্যবাদ!' অনুভা বললো। ব্যাগ খুলে পয়সা বার করে চা-ওয়ালার পয়সা মিটিয়ে দিলো।

একটু পরেই হলের আলো আস্তে আস্তে নিভ্‌তে লাগলো। অনুভা দরজার দিকে চেয়ে ছিলো। দেখছিলো তখনও লোক আস্‌ছে। ভাবছিলো লোকগুলো এমন শেষ মুহূর্তে আসে কেন? ভুলে যায় নাকি যে, তাদের আজ সিনেমা দেখতে হবে? এমন সময় দরজার পর্দা সরিয়ে হলে ঢুক্‌লো অমিয়!

অমিয়দা! অনুভা অমিয়কে দেখতে পেয়ে চমকে উঠ্‌লো। ভূত দেখেছে যেন!

তবু ভালো, হলের আলো সব নিভে গেলো। কিন্তু ইন্টারভালে যখন আলো জ্বলে উঠ্‌বে? তখন? কী সর্বনাশ! যদি অমিয়দা দেখে ফেলে? যদি ব'লে দেয় মাকে? চ'লে গেলে হয় না? কিন্তু সে তো ভালো দেখাবে না! অনুভা ঠিক করলো, বেশ, এখন নয়—ইন্টারভ্যাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হল থেকে বেরিয়ে যাবে।

বই দেখানো আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এইবার নিশীথের খেলা সুরু হোলো।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অতি সন্তর্পণে নিশীথ তার ডান হাতখানা অনুভার হাতলে-রাখা বাঁ হাতখানার উপর রাখলো। অনুভা কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিলো। নাছোড়বান্দা নিশীথ তাতে দমলো না। আবার তার ডান হাতটা রাখলো অনুভার বাঁ হাঁটুর উপর। অনুভা এবার তার বাঁ হাত দিয়ে নিশীথের হাত তার হাঁটুর উপর থেকে আস্তে ক'রে সরিয়ে দিলো।

অনুভার তখন ওসব ভালো লাগছিলো না। ওসব কেন—কিছুই ভালো লাগছিলো না। ছবির দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে,—ছবি নড়ছে, কথা বলছে, অথচ অনুভা কিছুই বুঝতে পারছে না। তার মাথায় তখন ঘুরছে 'অমিয়দা!' অমিয়দাকে যে কোনোদিন এতো ভয় করতে হবে তা' সে ভাবতেও পারেনি। অমিয়দা যে এতো ভয়ঙ্কর, সে তা' কল্পনাও করতে পারেনি। অনুভা ঘামতে লাগলো। তার ওপর নিশীথের উৎপাত হোলো সুরু :

—'রাগ করছো?' অনুভার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিশীথ জিজ্ঞেস করলো।

—'না।' অনুভা ছোট উত্তর দিলো।

—'তবে?'

—'ভালো লাগছে না।'

—'কোন্‌টা? আমাদের এই মিলন—না, ঐ মিলন?

—'কোনোটাই না।'

—'কেন?'

এমন সময় হঠাৎ অনুভার মাথায় বুদ্ধি এসে গেলো। এই রকম একটা কিছু নিশীথকে বলবার জন্যে মনে মনে খুঁজছিলো। বললো :

—'আমার মাথাটা বড়ো ধরেছে।'

—'তা এতলোকের সাম্‌নে মাথাটা তোমার টিপে দিই কী

ক'রে বলো তো?' নিশীথ নিজের রসিকতায় নিজেই চাপা হাসি হাস্‌লো।

—'ঠাট্টা নয় নিশীথদা। সত্যি বল্‌ছি।' অনুভা কাতর হ'য়ে বল্‌লো।

নিশীথ জিজ্ঞাসা করলো: 'এখন ধরলো বুঝি? ধরবেই তো, দরজা-জান্‌লা সব বন্ধ—তার উপর এতগুলো লোকের নিশ্বাস আর সিগ্রেটের ধোঁয়া।

—'আমি আর পারছি না থাকতে। বড্ডো মাথা ধরেছে—' অনুভা নিজের মাথাটা চেপে ধরলো।

—'তাইতো! আজকাল মেয়েরা দেখছি বাইরের হাওয়া পেয়ে ঘরের ভিতর থাকতেই চায় না। বেশ, ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।'

—'হ্যাঁ, নিশীথদা, তাই চলুন!'

—'আচ্ছা।'

অনুভা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। খানিকবাদে ইণ্টারভ্যাল হ'তেই অনুভা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে গেলো। হলের আলো তখন জ্বলে উঠেছে। অনুভার পেছনে চল্‌লো নিশীথ। কিন্তু দরজার দিকে তখন অনেকেরই লক্ষ্য। কাজেই সেখানে বেশ ভীড়। অনুভা দরজা দিয়ে সুবিধামতো বেরুতে না পেরে ভীড় না-কমা পর্যন্ত একপাশে দাঁড়ালো। ভীড় একটু কম্‌তেই অনুভা বেরিয়ে গেলো বাইরে; পেছন ফিরে দেখলো, নিশীথও বেরিয়েছে। বললো: 'শীগ্‌গীর এসো।'

দু'জনে হল থেকে বেরিয়ে সোজা বড়ো রাস্তায় চলে গেলো।

অমিয় ওদের দেখতেও পেলো না।

—সাত—

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বদলে-যাওয়া এ সংসারে অনেক কিছুই গেছে বদলে। সমাজ, সংস্কার, রীতি, নীতি—সব কিছু গেছে ওলোট-পালোট হ'য়ে। যুদ্ধ, যুদ্ধ যারা করবে—তাদের একদল তো হারবেই, আর একদল জিতবেই। এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যারা যুদ্ধ করলো না, অথচ যাদের বুকের উপর যুদ্ধ হোলো—দেখা গেলো, তারা ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে বসে আছে। গৃহী হারালো গৃহ, চাষী হারালো চাষের জমি, সতী হারালো সতীত্ব; আর সবাই হারালো স্বাস্থ্য।—খাদ্যাভাব। সারা বাঙলায় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিলো। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আবার দেখা দিলো এই বাঙলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর।

কত না পরিবার তাদের পৈতৃক জমিজমা, বাড়ীঘর বিক্রী ক'রে দিলো পেটের দায়ে। তবু যখন তাদের পেটের খিদে মিটলো না—তারা দলে দলে এলো এই কলকাতায়—ইংরাজের রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে! তারা এলো বটে—কিন্তু আশ্রয় পেলো না, খাদ্য পেলো না, সাহায্যও কোনোরকম পেলো না। কোনো কোনো দরদী গৃহস্থ ভাতটুকু খেয়ে তাদের ফ্যানটুকু দিলো। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান চালে-ডালে মিশিয়ে খিচুড়ী খাওয়ালো তাদের। গ্রামের সমৃদ্ধ চাষী,—যে সারাজীবনে এই বাঙলার মাটিতে কত ধানই না জন্মিয়েছে সে এই কলকাতার শানবাঁধানো ফুটপাথে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাসা বাঁধলো, আর মাটির সরা হাতে ক'রে একটু ফ্যানের জন্যে বাড়ীর দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা ক'রে মরলো। না খেতে পেয়ে অস্থি-চর্ম-সার হ'য়ে মরলো তারা ডাস্টবিনের ধারে; মরলো তারা গাড়ী চাপা প'ড়ে রাস্তার মাঝে। মেয়েদের মধ্যে যাদের বয়স আছে, যাদের শরীরে তখনও কিছু মাংস আছে, তারা ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে থেকেও

দুর্বৃত্ত, লম্পট পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। ব্যাফ্‌ল্‌-ওয়ালের নির্জন আঁধারে 'নারী-মাংসের' বাজার বসলো নিয়মিত। অনেক ক্ষেত্রে তারা দেহ বাঁচাবার জন্যে নিজেরাই যেচে দেহ বেচ্‌লো! তবু বাঁচলো না!

বুভুক্ষা তাদের মানসম্ভ্রমের পর্দা দিলো ছিঁড়ে। আচার-ব্যবহার ভুলে গেলো তারা। বাপ পেটের দায়ে মেয়েকে বেচলো। মা ছেলের মুখের খাবার নিজে খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলো। স্ত্রী স্বামীর জ্ঞাতসারেই করলো ব্যাভিচার······কেউ কাউকে বাধা দিলো না! বরং প্রশ্রয় দিলো দুটো খেতে পাবার লোভে!

দুটো খেতে পাবার লোভ!—বোধকরি অন্যায় লোভ হয়েছিলো বাঙালীর পক্ষে!! তাই বুঝি লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হোলো বাঙালীর? বাঙলার শ্মশানের চিতা বুঝি শূন্য প'ড়ে ছিলো? তাই শ্মশানদেবতার অনুরোধে বিধাতা রাশি রাশি অস্থি-চর্ম-সার মৃতদেহ এনে চিতা বোঝাই করে দিলেন?

*　　　*　　　*

দেশের এমনি হাহাকারের দিনে আভার বিয়ের ফুল ফুটে উঠ্‌লো। না পাওয়া যায় ভালো কাপড়-চোপড়, না-পাওয়া যায় খাবার জিনিষ: সোনাতে হাতই দেবার উপায় নেই। আগে বাজারে জিনিষ থাকতো —হাতে টাকা থাকতো না। এখন হাতে টাকা আছে লোকের, কিন্তু বাজারে জিনিষ নেই। যা' দু'একটা জিনিষ পাওয়া যায় তা' 'কালো-বাজার' নামে এক অদ্ভুত বাজার থেকে আনতে হয়—অন্ধকারে, পেছনের দরজা দিয়ে মজুতদারের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে!

কাগজে বিজ্ঞাপনও বেরোয় অদ্ভুত রকমের। আগে রেল কোম্পানীরা

বলতো : এখানে ওখানে বেড়াও, কম ভাড়ায় টিকেট পাবে। এখন বলে, দরকার ছাড়া ট্রেনে উঠো না। কাপড়ের কলওয়ালারা বলে : কাপড় সাম্‌লে পরো—পরে কাপড় পাবে না! টায়ার কোম্পানী বলে : মোটরের টায়ার বাঁচাও! আর সরকার বলে : খাদ্য জন্মাও, আর অপচয় কোরো না!

অপচয়? খাবার থাকলে তো অপচয়! আগে প্রত্যেক বাড়ীর কলতলায় কত না ভাত প'ড়ে নষ্ট হয়েছে। আর এখন—ভাত তো দূরের কথা—ফ্যানটুকু পর্যন্ত লোকের কাছে সুখাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তবু—তবু অমিয়র কাকা এ সুযোগ ছাড়লেন না। আভার বিয়ে দিলেন। বিয়ে হোলো অমিয়র কাকারই এক বাল্যবন্ধুর বড়ো ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো। ব্যবসা করছে : চীনেবাজারে নিজের স্টেশনারী দোকান আছে। ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ী।

তবে বিয়েটা হোলো একটু অদ্ভুত রকমের! তা'—সময়টা যখন অদ্ভুত চলেছে তখন বিয়েটা যে অদ্ভুত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

অবশ্য এ-ধরণের বিয়েটা হোলো শুধু সুরেশবাবু, অর্থাৎ ছেলের বাপের জেদেই। অমিয়র কাকা বরং এই অসময়ে আভার বিয়ে দিতে প্রথমে রাজী হননি। তাঁর মনে একটু দ্বিধা ছিল : নিজের মেয়ে হ'লে কথা ছিলো না। কিন্তু এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে ভাইঝিকে নমো-নমো ক'রে বিয়ে দিলে লোকে বলবে—'টাকা বাঁচাচ্ছে।'

ভাবী বেয়াই শুনেই বাধা দিয়ে উঠলেন : 'ওসব তুমি ভেবোনা নরেন। লোকে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়! আমি তোমার ঐ ভাইঝির সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ে দেবো। বড়ো সুলক্ষণা মেয়ে হে, বড়ো সুলক্ষণা মেয়ে! ও মেয়েকে আমি ঘরে আনবোই—আর তোমার ঐ সব বাজে লোককে এ বিয়েতে ডাকবোই না—কাজেই নিন্দে করবে কারা বলো?'

—'তুমি বলো কী?' অমিয়র কাকা অবাক হ'য়ে গেলেন : 'আর মেয়েরাই বা রাজী হবেন কেন?'

—'আরে নাও! মেয়েরা মানে তো তোমার বৌ? আমার তো ওসব চুকেই গেছে। তা' চলো দেখি, শুনি আমার ভাবী-বেয়ান কী বলেন?'

ভাবী-বেয়ান দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। অমিয়র কাকার সঙ্গে সুরেশবাবু বাড়ীর মধ্যে এসে ভাবী-বেয়ানের দেখা পেলেন। হেসে বললেন : 'নমস্কার, বেয়ান-ঠাকরুণ! পরামর্শ করতে এলাম। একটু বসতে দিন্। আমি আবার দাঁড়াতে পারিনে—কোমরে ব্যথা!'

অমিয়র কাকীমা তাঁদের ঘরে বসতে দিলেন। এমন সময় অমিয় সেখানে এসে উপস্থিত হোলো।

সুরেশবাবু বললেন : 'যাক্, ভালোই হোলো—অমিয় এসেছে। শুনুন বেয়ান-ঠাকরুণ, তুমিও শোনো বাবা অমিয়,—আমার প্রতাপ বাবাজীর সঙ্গে আভা-মার বিয়ে দোব নতুন রকমে। বাইরের লোক কাউকে নেমতন্ন করা হবে না। কী হবে ক'রে? পেট ভ'রে খেয়ে, বাইরে গিয়ে তো গালাগাল করবে? আর ঐ বরযাত্রীগুলো? বাড়ীতে হয়তো ডাল-ভাত জোটে না, আর বরের সঙ্গে এলেই নবাবপুত্তুর হ'য়ে যান! লুচি একটু ঠাণ্ডা হ'লে আর রক্ষা নেই! আর আমি নিজের চোখে দেখেছি গেরস্তকে জব্দ করবার জন্যে ন্যাড়াছাদের ধারে খেতে ব'সে লুচি নিয়ে নিয়ে বাড়ীর পেছনের গলিতে ফেলে দিচ্ছে। এদের ভগবান না-খাইয়ে মারবেন না তো কাদের মারবেন?' ভদ্রলোক এবার একটু হেসে নিজের বাহাদুরির কথা বললেন : 'তা, আমিও দিয়েছিলুম উল্টো জব্দ ক'রে।'

অমিয়র কাকা বললেন : 'কী কোরে?'

সুরেশবাবু আরম্ভ করলেন : 'প্রথমটা বুঝতে পারিনি। আমার ভাগ্নীর বিয়েতে পরিবেশনে তদারক করছি। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো, পাশাপাশি

তিনজন বরযাত্রীর পাতে লুচি পড়তে না পড়তে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে! তাদের অলক্ষ্যে একটু লক্ষ্য করতেই দেখি—ঐ কাণ্ড! ভাগ্নে পরিবেশন করছিলো, তাকে তখুনি আড়ালে ডেকে ব'লে দিলাম—এখুনি একটা বিছানার চাদর, আর তার একজন বন্ধুকে নিয়ে, পেছনের গলিতে গিয়ে, চাদর বিছিয়ে ধরতে। আর একজনকে পাঠালাম ঝুড়ি হাতে, ঐ সব চাদরে-পড়া লুচি এনে ঐ তিন বরযাত্রীকে দেবার জন্যে! বেশ চল্‌তে লাগলো: গোল লুচি গোলাকার হ'য়ে, ছাদ থেকে গলিতে, চাদরে, আবার চাদর থেকে ঝুড়িতে করে তাদের পাতে! শেষ পর্যন্ত নিজেরা জব্দ হ'য়ে, ক্ষুব্ধ হলেন। লুচি নেওয়াও বন্ধ করলেন।'

—'কী কাণ্ড!' অমিয়র কাকীমা বললেন।

—'ওদের ধরে আচ্ছা ক'রে প্রহার দেওয়া উচিত ছিলো।' অমিয় বললো।

—'সামাজিক কাজে ওসব করা যায় না, বাবা। হাজার দোষ করলেও বরপক্ষের কোনো দোষই হয় না, দোষ হবে কন্যাপক্ষের! বাঙালীর সমাজ বড়ো মজার সমাজ! বড়ো হও—চিন্‌বে!'

—'দেখো বাপু—'অমিয়র কাকা বললেন: 'তুমি যেন দু'চারটে ঐ ধরণের বরযাত্রী এনো না। একেবারে মারা পড়বো।'

—'আরে বাপু, সেই জন্যেই তো বলছি,—বাইরের লোকের দরকার নেই আমাদের।' সুরেশবাবু বললেন: 'জানো তো, লোকে বিয়ের ব্যাপারে যত না ভাবে; খাওয়ানোর ব্যাপার নিয়ে আরো বেশি ভাবনায়-চিন্তায় অস্থির হোতে হয়। অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, তবু মন পাওয়া যায় না।'

—'কিন্তু আমাদের তো অনেকে নেমতন্ন করেছেন তাঁদের কাজে। আমরা না করলে কেমন দেখাবে?' অমিয়র কাকা বললেন।

—'তাঁদের চোখে খারাপ দেখাবে এবং ভবিষ্যতে তাঁদের কাজে

তোমাকে করবেন না। এভাবে অনেককেই যদি তাঁদের না করতে হয় তবে তাঁদের অনেক খরচা যাবে বেঁচে। আমাদের সমাজ সংস্কারমুক্ত হয়ে বাঁচবে।'

—'বেশ, তুমি কী করতে চাও বলো ?'

—'বিয়ে হবে তোমার বাড়ীর ছাদে—কিংবা যদি জায়গা না থাকে—কোনো স্কুলবাড়ী ভাড়া নিয়ে তার হলঘরে। ঘরটি চমৎকার ক'রে সাজাতে হবে নানা রঙের আলো দিয়ে, ফুল দিয়ে, আমের পাতা দিয়ে, ধূপধূনোতে ঘর ভরিয়ে দিতে হবে। ঘরে ঢোকবার মুখে দুটো মঙ্গলঘট বসানো থাকবে। ঘরের মাঝখানে যেখানে বিয়ে হবে সেখানটায় চমৎকার করে আলপনা দিতে হবে। আর তার দু'দিকে থাকবে সতরঞ্চ বা কার্পেট পাতা। বিয়েতে নেমতন্ন করা হবে শুধু মেয়ের পক্ষের এবং ছেলের পক্ষের নিকট-আত্মীয়দের। বিয়ের দিন বরের সঙ্গে তার আত্মীয় আত্মীয়ারা আসবেন বিয়ে বাড়ীতে। বিয়ের সময় দু'পক্ষের মেয়েরা একদিকে এবং ছেলেরা আর একদিকে বসবে। সেই সময় তাঁদের গায়ে গোলাপজল, হাতে পান, প্রীতি-উপহার যদি ছাপা হ'য়ে থাকে, দেওয়া হবে।'

—'তারপর ?' উৎসুক হয়ে উঠলেন অমিয়র কাকা।

—'তারপর লগ্ন হ'লে বিয়ে আরম্ভ হবে। পুরুত একজনই থাকবে। দুই পুরুতের ঝগড়ার দরকার নেই। বিয়ের মন্ত্র কিন্তু বাঙলায় হবে। বরকনে জানুক—তারা কী দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সবাই মন দিয়ে দেখবে। ওটি চলবে না যে, বিয়ে কোথায় হচ্ছে খোঁজ নেই—কেবল পাতা হচ্ছে কিনা খোঁজ! সত্যি, বিয়ে হোলো কি, না হোলো তার খবর কেউ রাখে না; অথচ হিন্দুর বিয়েতে লোক নেমতন্ন করা মানে নাকি সাক্ষী রাখা।······হ্যাঁ, তারপর ঐ স্ত্রী-আচার! ওটা হবে—নইলে মেয়েরা মনে বড়ো কষ্ট পাবেন। কী বলুন, বেয়ান ঠাকরুণ ?'

—'নিশ্চয়ই।' ভাবী-বেয়ান বললেন।

—'স্ত্রী-আচার হবে। তবে কনেকে অমন পিঁড়ের ওপর চাপিয়ে সাতপাক ঘোরানো চলবে না।'

—'সাতপাক ঘোরানো চলবে না? বলো কী হে?' অমিয়র কাকা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন: 'বিয়েই যে তবে অশুদ্ধ হয়ে যাবে!'

—'কী মুস্কিল! সাত পাক কেন, চোদ্দ পাক ঘুরিয়ে বাঁধন শক্ত ক'রে নিয়ো। তবে পিঁড়িতে চড়িয়ে নয়—হাঁটিয়ে! পিঁড়িতে চড়ে, পড়ে যাবার ভয়েই মেয়ের প্রাণ যায় উড়ে; প্রাণভয়ে বরের মুখখানি পর্যন্ত প্রাণভ'রে দেখতে পারে না!'

—'আঃ, কী যে বলো!' অমিয়র কাকা বললেন। কাকীমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসলেন। অমিয় বেচারী চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো—যেন কিছু বুঝতে পারেনি।

সুরেশবাবু বললেন: 'এতে লজ্জার কী আছে? আমার মনে হয় কী জানো? ঐ শুভদৃষ্টি ভালো করে হয় না বলেই বোধহয় বিয়ের পর প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে মিল হয় না। যাক্‌গে, যা' বলছিলাম—বিয়ে হ'য়ে গেলে বরকে মাঝখানে নিয়ে দু'পক্ষের পুরুষ আত্মীয়রা এক সারিতে, আর কনেকে মাঝখানে নিয়ে দু'পক্ষের মেয়েরা সামনের সারিতে খেতে বস্‌বে। তখন আমি, তুমি, আর বেয়ান ঠাকরুণ দু'পক্ষের আত্মীয় স্বজনদের পরিচয় করিয়ে দেব। তারপর বাসরঘরে গিয়ে গানবাজনা হোক। যার-যা দেবার দিক্।···আসল কথাই কিন্তু বলা হয়নি।'

—'কী?'

—'বলি, ছেলে দেবো যে, টাকা দেবে না? ওকথা যে তুলছোই না। সে কথাও কি আমাকে তুল্‌তে হবে?'

—'তা তুমি নেবে, তুমি তুলবে না?'

—'বেশ! শোনো তবে।' সুরেশবাবু ভারিক্কি চালে আরম্ভ করলেন:

—'তুমি যা' দেবে ছেলেকে দেবে আর আমি যা' দোবো মেয়েকে দোবো। ব্যস্! বিয়ের দিন, খাওয়া-দাওয়া বা অন্য খরচ যা' লাগে তার অর্ধেক আমি দেবো আর অর্ধেক তুমি। রাজি তো ?'

—'হাতে চাঁদ এনে দিলে, তবু রাজি হবো না! তোমার মতো ছেলের বাপ পেলে বাঙলার মরা সমাজ আবার বাঁচতে পারতো!' আরো বল্তে যাচ্ছিলেন অমিয়র কাকা, কিন্তু সুরেশবাবু থামিয়ে দিলেন : 'থামো, থামো—বাজে ব'কো না।'

—'কিন্তু একটা কথা।' অমিয়র কাকা বললেন : 'তা হোলে তোমার বাড়ীতে বৌভাতের দিনের অর্ধেক খরচ আমি দোবো।'

সুরেশবাবু শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন : 'বৌভাতে কোনো খরচই নেই তো খরচ করবে কিসে ? ভাবছো বুঝি, তোমার বাড়ীতে কাউকে নেমন্তন্ন করতে না দিয়ে আমার বাড়ীতে সবাইকে নেমন্তন্ন করবো ? কী যে বলো! এক বিয়েতে একবারই খাওয়া-দাওয়া হবে। ব্যস্! খরচ করতে চাও—বরং, ঐ সব গরীব-দুঃখীকে, ভিখিরীদের ডেকে খাইয়ে দাও, পয়সা দাও, পারো তো কাপড় বা কম্বল দাও। বরকনেকে আশীর্বাদ করবে।'

অমিয়র কাকীমা বললেন : 'ফুলশয্যার কী হবে ?'

সুরেশবাবু হেসে উঠলেন : 'ঐ ছাখো হে নরেন! গিন্নী তোমার ফুলশয্যার কথা ভোলেন নি কিন্তু!'

—'আরে বাপু, উনি আমার ফুলশয্যার কথা বলছেন না—আভার ফুলশয্যার কথা বলছেন।'

অমিয়র কাকার কথা শুনে এবার সবাই হেসে উঠলেন।

সুরেশবাবু বললেন : 'ফুলশয্যা নিশ্চয়ই হবে। অমন কাব্যিক ব্যাপার বাদ দেওয়া যায় নাকি ? দেখো, আমি কেমন ঘর সাজিয়ে দেবো।'··· সুরেশবাবু ভাবাবেগে বললেন, : 'আহা হিন্দুধর্মটা বড়ো কাব্যিক হে!

বসন্তের রঙখেলা, রাখী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন, বিজয়ার কোলাকুলি—বড়ো কাব্যিক গো, বড়ো কাব্যিক! এমনটি কোথাও পাবে না। তবু পোড়া হিন্দুরা এসব করতে চায় না। লজ্জা করে নাকি?' হ্যাঁ, ভালো কথা! ফুলশয্যার রাত্রে আভা-মার বান্ধবীরা এবং দু'পক্ষের ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়রা শুধু আসবেন। তাঁরাই ফুলশয্যার ব্যবস্থা করবেন আর নতুন বরকনেকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বুড়ো ছেলের বাড়ীতে দুটো শাকভাত খেয়ে যাবেন। ভালো হবে না?'

—তা' ভালোই হবে।' অমিয়র কাকীমা মত দিলেন।

* * *

শুভদিনে এই অদ্ভুত ধরণের বিয়ে হয়ে গেলো। বরের মেসোমশায় খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন। তিনি এসেছিলেন বিয়েতে। দু' চারদিন পরে দেখা গেলো— খবরের কাগজে বরকনের ছবি দিয়ে এই অপূর্ব বিয়ের এক প্রশংসা-ভরা বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছে।

আভার বিয়ের দিন অনুভাদের আসতে বলা হয়নি। অমিয়র ভালোই হোলো তাতে। দেখা হলেই তো দুটো কথা বলতে হোতো— অন্তত ভদ্রতার খাতিরে। অনুভাও বেঁচে গেলো—অমিয়র সামনে পড়তে হবে না ভেবে। কেন? লজ্জা? ঘৃণা? ভয়?···কিসের জন্যে সে অমিয়কে এড়িয়ে যেতে চায়? তা' হয়তো অনুভা বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবে এটুকু সে স্পষ্ট বলতে পারে—অমিয়কে সে আর চায় না, চায় না, চায় না। যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়। তাকে অনেক সেধেছে; পেয়েছে অবহেলা। শুধু অবহেলা নয়—অপমান। বরং অনুভার মনে হোলো: নিশীথদা তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। অমিয়দার চাইতে নিশীথদা অনেক ভালো। অমিয়দা নিষ্ঠুর, নিশীথদার হৃদয় আছে। অমিয়দা অহঙ্কারী, নিশীথদা বিনয়ী। অমিয়দা শুধু হুকুম করতেই পারে, নিশীথদা তার কথা হুকুম ব'লে মেনে নেয়। অমিয়দা স্বার্থপর, নিশীথদা

বুঝি তার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।…অনুভা ভাবলো : এতদিন সে খুবই ভুল করেছে।

আভার ফুলশয্যার দিন অনুভা গেছলো। লীনাও গেছলো। অনেক-দিন পরে অনুভার সঙ্গে লীনার দেখা হোলো। কী জানি কেন, অনুভা একসময় জিজ্ঞেস করে বস্‌লো তাকে : 'অমিয়দা তোমাদের বাড়ী খুব যান—না ?'

লীনা সরল ভাবেই বললো : 'কৈ, খুব তো নয়! তবে মাঝে মাঝে যান। পাশ করেছেন ব'লে একদিন ধরলাম—খুব খাওয়ালেন।'

—'পাশ করেছেন ? কবে ?' অনুভা একটু বিদ্রূপের সুরে বললো : 'বি. এ. পাশের খাওয়াটা তোমরাই খেলে। কিন্তু তোমাদের বিয়ের খাওয়াটায় যেন বাদ না পড়ি আমরা—'

—'তার মানে ?' লীনা রেগে উঠ্‌লো।

—'মানে আমার চাইতে তোমরাই ভালো জানো।' ব'লেই অনুভা আর একবার বিদ্রূপের হাসি হেসে চ'লে গেল লীনার কাছ থেকে।

আভা এ সবের কিছুই জান্‌লো না। শুধু দেখলো, এতক্ষণ লীনা খুব হাসি গল্প করছিলো—হঠাৎ কেন যেন গম্ভীর হ'য়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলো : 'কী হয়েছে, লীনা ?'

লীনা বললো : 'কিছু না। শরীরটা কেন যেন ভালো লাগছে না।'

—আট—

নেবো, অথচ দেবো না—এ চেষ্টা অনেকেই করে। কিন্তু দেবো, অথচ নেবো না—একথা ভাবাও যায় না এ যুগে।…গরীবের ছেলে তুমি, এ বাড়ীতে থেকে খেয়ে লেখাপড়া করতে চাও? বেশ! তবে থাকা খাওয়ার বদলে দু'বেলা আমার চারটি ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে!… তুমি কী চাও? তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা? পাবে। কিন্তু তোমার বাড়ীখানি আমার কাছে বাঁধা রাখতে হবে, বেশি নয়, শতকরা ১৮৲ টাকা সুদে।…তোমরা কেন হে? কী, মেদিনীপুরের বন্যার জন্যে চাঁদা? না, না—ওসব হবে না এখানে।—কী, কী, জলসার ব্যবস্থা করেছো? কুমারী মঞ্জুলিকা সেন নাচবেন আর ছেলেমেয়েরা 'এমন চাঁদনী রাতে' অভিনয় করবে? তা' কত করে টিকিট করেছো? না, না, বেশি দামের নয়—দেড় টাকা দামের দু'খানা টিকিট দাও।

আসল কথা, কিছু দাও, তবে দেবো। কিছু দেবে না, অথচ পেতে চাও, এ যুগের এ তুমি কেমনতর নির্লজ্জ?

তাই এই দেওয়া-নেওয়া যুগের হালচাল জানা বাগবাজারের 'সবুজ দল' ঠিক করলো—দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে তারা অভিনয় করবে। অভিনয়ে টিকিট বিক্রী ক'রে যে টাকা হবে তা' থেকে স্টেজের খরচ, ড্রেসের খরচ, এমেচার আর্টিস্টদের ট্যাক্সি-খরচ, চপ-কাটলেট-অমলেট-চা-সোডা-পান-সিগ্রেট-লেমনেড ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়ে, যা' থাকবে, তা' দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যে দেওয়া হবে।

—'তা তো হোলো।' 'সবুজ-দল'-এর একজন সভ্য সন্দেহ করলো: 'এত খরচ করে টাকা বাঁচলে হয়!'

শুনেই আর একজন সভ্য অসভ্যের মতো চেঁচিয়ে উঠ্লো: 'আরে

খোকা, ৫৲।১০৲ টাকাও যদি বাঁচে তাই যথেষ্ট। কোনো দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতিকে দিয়ে আমাদের নাম ছাপিয়ে দেবো কাগজে আমার ভগ্নী-পতিকে দিয়ে।'

—'আর যদি টাকা না বাঁচে ?' সন্দিগ্ধ সভ্য জিজ্ঞেস করলো।

অভিনয়-উৎসাহী সভ্য সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো : 'টাকা না বাঁচে, না বাঁচুক! দুর্ভিক্ষের নামে তো টিকিট বিক্রী ক'রে, খানিকটা বিনা পয়সায় নাচগান আর খ্যাট হয়ে গেলো। আর সেই সঙ্গে—' চোখ নাচিয়ে হেসে বললো : 'বুঝেছিস তো? মেয়েদের সঙ্গে একটু ভাবও করা যাবে। কী বল্ ?'

—'মেয়ে!' 'সবুজ দলের' অযোগ্য সভ্য আবার জিজ্ঞেস করলো : 'আমাদের সঙ্গে অভিনয় করবার মতো ভালো মেয়ে কোথায় রে ?'

—'তার মানে?' দলের সুযোগ্য সভ্য উত্তর দিলো : 'মেয়ে পাবো না অভিনয় করবার জন্যে ? যে দেশে মেয়ে জন্মালে বাপ-মায়েরা কাঁদে সে দেশে আবার মেয়ের অভাব? শোন্ তবে,—বই, মেয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

—'কে করলো ?'

—'নিশীথদা। তার বন্ধু মোহনবাবু 'সোনার বাঙলা' নামে আজ-কালকার ব্যাপার নিয়ে এক নতুন ধরণের নক্সা লিখে দিয়েছেন। ড্রেস, সীন তেমন দরকার হবে না নাকি। আর মেয়ে মাত্তর একটি দরকার। সে পার্ট কে করবে জানিস ?—নিশীথদার এক লেডী-ফ্রেণ্ড!···

—'আর কিছু হবে না ?'

—'হবে। অভিনয়ের আগে জলসা হবে। কুমারী তপতী রায়, রীণা লাহিড়ী, ডলি দত্ত নাচবে, আর কল্যাণী সোম, অরুন্ধতী ধর, কেতকী সান্ন্যাল, প্রদীপ সেন আর সরোজ মিত্র গান গাইবে। কৌতুক করবে বৃন্দাবন হালদার।

মাসখানেক পরে একদিন 'রঙমহলের' রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠলো। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্যে আধুনিক অন্নপূর্ণারা 'সবুজ-দল'-এর ব্যবস্থাপনায় নাচলো, গাইলো। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে মুখভঙ্গি ক'রে কৌতুক দেখতে হোলো দর্শকদের, মানে, টিকিট কিনে দুর্ভিক্ষে সাহায্যকারীদের। তারপর বিরামের পর আরম্ভ হোলো 'সোনার বাঙলা' অভিনয়।

[সাদা পোষাক পরা। মাথায় পাগড়ী। কানে খাগের কলম। হাতে খাতা সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ঐতিহাসিক পথ খুঁজতে খুঁজতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন]

এই সেই বাঙলাদেশ! সেই পথ, সেই ঘাট, সেই নদী। তবু কেন চারিদিক জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে? এখানে-ওখানে মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে। গ্রামে লোক নেই। নদীতে নৌকো নেই। মাঠে ধান নেই। ধনধান্য পুষ্প-ভরা বাঙলার এ কী শোচনীয় দুর্দশা! একি মরুভূমি না শ্মশান? এই বাঙলার ঐশ্বর্যের কথা, বীরত্বের কাহিনী কত রকমে, কতবার আমি সোনার অক্ষরে লিখে গেছি! আর আজ—আজ তেরশ' পঞ্চাশ সালে সেই সোনার বাঙলার এ কী দুরবস্থা!···আমি—আমি পথ ভুল করিনি তো? এটা বাঙলা দেশই তো?···কী জানি? বুড়ো হয়েছি—হয়তো বা পথই ভুল করলাম! তা কাউকে দেখছিও তো না--যে সঠিক পথের খবর নেবো।··· [একটু লক্ষ্য করে]···ঐ যে, কে না আসছে এদিকে? দেখি, ওকেই জিজ্ঞেস করবো।

[একজন বাঙালীর প্রবেশ। খালি গা, পরণে শুধু ধুতি—হাঁটু পর্যন্ত। প্রৌঢ়, তবু লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হ'য়ে চলছে। পিঠে পাঁচটা ছোট ছোট বোঁচকা বাঁধা। তার

এক-একটিতে লেখা : 'আয়-কর' 'বিক্রয়-কর 'ব্ল্যাক-মার্কেটের দর', 'মহামারী' ও 'বোমাবর্ষণ।' ডান হাতে লেখা : 'আগস্ট আন্দোলন।' বাঁ হাত লাঠিতে ভর দেওয়া। লাঠিতে লেখা—'আশা।' পেটের কাছে লেখা 'দুর্ভিক্ষ।' এক পায়ে শিকল বাঁধা—'পরাধীনতা।' আর এক পায়ে লেখা—'ভারত রক্ষা আইন।']

ঐতিহাসিক।—কে তুমি ?

বাঙালী।—আমি বাঙালী—

ঐতিহাসিক।—এ কী তোমার অদ্ভুত সাজ !

বাঙালী।—অদ্ভুত সাজ ? কেন, এ সাজ তোমার ভালো লাগ্‌লো না ?

ঐতিহাসিক।—তুমি পাগল নাকি ?

বাঙালী।—কী ? কী বল্‌লে ? আমি পাগল ? যে বলে সে পাগল।

ঐতিহাসিক।—পাগল নয় তো এসব কী পিঠে করেছো ? হাতে পায়ে ওসব কী বাঁধা ?

বাঙালী।—ওঃ, বুঝতে পেরেছি। তুমি এদেশে নতুন এসেছো। এই তেরশ পঞ্চাশের বাঙলার কিছুই জানো না তুমি।

ঐতিহাসিক।—সেই সব জানতেই তো এসেছি আমি। আমি ঐতিহাসিক। বাঙলার অবস্থা লিপিবদ্ধ করবার জন্যেই আমার আসা।

বাঙালী।—বলো, দুরবস্থা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে তোমার এখানে আসা। কিন্তু বলো তো বৃদ্ধ, এককালে তোমার যে লেখনী দিয়ে এই সোনার বাঙলার ঐশ্বর্যের, প্রাচুর্যের কথা লিখে গেছো, সেই লেখনীতে পারবে এই বাঙলার দুর্ভিক্ষের, বস্ত্রসঙ্কটের ভয়াবহ কাহিনী লিখতে ? পেটে 'দুর্ভিক্ষ' লেখাটা দেখালো।

ঐতিহাসিক।—বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে ?

বাঙালী।—হ্যাঁ! তার উপর বাঙলায় দেখা দিয়েছে মহামারী

ব্যাপকভাবে। ব্ল্যাকমার্কেটে মুনাফাখোররা ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করছে অন্যায় দাম। সরকার আদায় করছে বিক্রয়-কর আর আয়-কর। বাঙালীর মাথার উপর ফাটছে বোমা।···

ঐতিহাসিক।—এত শাস্তি হয়েছে বাঙলার!

বাঙালী।—তবু বাঙালী দমেনি। মরছে তবু ডর্‌ছে না। ভারত-রক্ষা আইনে তার এক পা বাঁধা। আর এক পা পরাধীনতার শৃঙ্খলে। বুকে আঁশা নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে এই শ্মশানের মাঝে দাঁড়িয়েও স্বাধীনতার জন্যে করছে আন্দোলন।

ঐতিহাসিক।—আমি তোমাকে এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।

বাঙালী।—বাঙালীকে সহজে কেউ বুঝতে পারে না, ঐতিহাসিক। আর এ সাজ পাগলের সাজ নয়—বুঝলে তো এখন? এই হচ্ছে বাঙালীর প্রকৃত সাজ—তেরশ' পঞ্চাশের সাজ,—বিদেশীর চোখে পাগলের সাজ! ··এসো ঐতিহাসিক, তুমি আমার সঙ্গে।

ঐতিহাসিক।—কোথায়?

বাঙালী।—কেন, বাঙলায়! সোনার বাঙলার পথঘাট তোমার জানা ছিল। কিন্তু এ শ্মশান বাঙলার পথঘাট তো তুমি চিন্‌বে না। পথ তুমি হারিয়ে ফেলবে।

ঐতিহাসিক।— সত্যিই—পথ ঘাট আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বাঙালী।—জানি। তাই তো বল্‌ছি, এসো আমার সঙ্গে।

ঐতিহাসিক।—চলো।

[দৃশ্য পরিবর্তন]

বাঙালী।—এইখানে অপেক্ষা করো। গোপনে। যা দেখবে—সঠিক বিবরণ লিখে যেও—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। আমি আসি।

[প্রস্থান। ঐতিহাসিক কাগজ কলম নিয়ে বসলো। এমন সময় এক সাহেববেশী লোকের প্রবেশ। ফুলপ্যাণ্টের সঙ্গে সার্ট পরা। মাথায় টুপি, পায়ে জুতো। কাঁধে একটা সাইনবোর্ড—বাঁ হাতে ধরা। তাতে লেখা: "ধন্য তোমরা ধন্য!"]

সাহেববেশী।—(সাহেবী সুরে) ঢন্য, ঢন্য, টোমরা ঢন্য।
আমরা ভাবছি টোমডের জন্য॥
কী করে পাবে ঢন ও ঢান্য।
কেম্‌নে পাবে বাহিরে মান্য॥
কেব্‌লি ভাবছি মোরা সে জন্য।
ভাব্‌না এছ্‌ড়া নাহিক অন্য॥
ভাব ডেখি আজ কী সৌজন্য।
ড্যাখছি শুধু টোমডের জন্য॥
এটুও টোমরা নও কি ঢন্য?
অঠচ টোমরা এমনি বন্য—
মানে করে নাও বিশ্রী অন্য॥
এই যে যুদ্ধ, এই যে সৈন্য।
এসব কেনো? কাডের জন্য?
সট্যি, টোমরা এট জঘন্য।
বুঝটে চাওনা এ সৌজন্য॥
এটুদিন ছিলে অস্‌ভ্য, নগণ্য।
মোডের ডয়াতে গণ্য মান্য॥
হয়ছো আজকে বুঝছ বন্য?
বোকার মটন ভেব্‌না অন্য।
যা' করি, টোমরি ভাল্‌রই জন্য।

বলো প্রাণ খুলে : ধন্য ধন্য!
টোমদের ডয়াতে আমরা ধন্য!

[প্রস্থান। তার পেছন দিক থেকে আর একজন লোক ঢুকলো। মাথায় পাগড়ী, পেট মোটা। একহাতে থলে, তাতে লেখা : চাউল ১০০৲ টাকা মণ। বগলে কাপড়ের বাণ্ডিল, তাতে লেখা : মিলের ধুতি সাড়ী ২০৲ টাকা জোড়া।]

মুনাফাখোর।—সত্যিই ধন্য আমরাই ধন্য।
যুদ্ধ বেধেছে আমাদেরি জন্য॥
আউর জোরসে বাধুক লড়াই।
ভাঙুক হের হিটলারের বড়াই॥
সবাই মরুক, আমি যেন বাঁচি।
ও মা, তোর কাছে এই বর যাচি॥
নিভুক ঘরের যত সব আলো।
ব্ল্যাক আউটই সবচেয়ে ভালো॥
ব্ল্যাক মার্কেট—কালো বাজার।
আহা কী মজার, ওহো কী মজার॥
রূপোর টনিক আজ নেই যার।
কালো বাজারেতে সে শুধু ব্যাজার॥
নইলে মজার বাজার এমন
দেখেছ কি কেউ জীবনে কখনো?
সাদা বাজারেতে পাবে নাকো যা'।
কালো বাজারেতে পাবে তুমি তা'॥
চাও তুমি তেল, নুন, চাল ডাল।
সব পাবে তুমি। নহে এটা চাল॥

সাড়ী চাও পাবে, পাবে ভালো ধুতি ॥
ঠাস বুনুনের, খুব মিহি সুতি ॥
তবে মনে রেখো, দিনমানে নয়।
এসব ব্যাপার আঁধারেতে হয় ॥
এসো না তা' বলে সদর দুয়ারে।
পেছন দুয়ারে এসো চুপিসারে ॥
এনো সাথে করে নগদ রূপিয়া।
দেখবে তখন সব মিল্ গিয়া ॥
এসব যদি না মজুত ক'রে।
রাখতাম ভ'রে আমার ঘরে।
কেমনে পেতে তা' বলো তো ভাই।
অথচ এসব সবারই চাই।
আজ ছিলো তাই হোলো উপকার।
নইলে এমন কী দায় আমার?
আমি বড় ভালো, তুমি বড় ভালো।
তাই উপকার ক'রে দেওয়া হোলো।
তবু আমি নাকি বড়ো জোচ্চোর।
লোকে দেছে নাম—মুনাফাখোর।

[এমন সময় একটি ভিখারিণী মেয়ে—রোগা, ময়লা কাপড় পরণে। মাটির সরা হাতে করে এসে উপস্থিত হোলো এবং মুনাফাখোরকে দেখে বললো।]

ভিখারিণী।—বাবা, একটা পয়সা দাও
কিংবা একটু ফ্যান্—

মুনাফাখোর।—ফ্যান্! কোথায় পাবো ফ্যান্?

ভাগ শীগগীর—
করিসনে ঘ্যান্ ঘ্যান্!

ভিখারিণী।—তবে একটা পয়সা—

মুনাফাখোর।—পয়সা নয়কো সস্তা—
ভাবছো বুঝি পয়সা বেরোয়
ঝাড়লে পরে বস্তা? [প্রস্থান]

ভিখারিণী।—(মাগো) একটা পয়সা দাওনা মাগো
ছুটি পায়ে পড়ি।
সারাদিন খাইনি কিছু
প্রাণে যে মা মরি॥
অপাত্রে দান হবে না মা
আমিও তোমার মেয়ে।
দয়া করে গ্যাখো একটু
আমার দিকে চেয়ে॥
তোমার মত স্বামী-পুত্র
আমারও মাগো ছিলো।
বড়ো সুখে ছিলাম মাগো
এমন কেন হোলো?
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে
ছিলাম বড়োই সুখী।
আজ বুঝি মা, আমার চেয়ে
নেইকো কেহ ছুখী॥
কী কুক্ষণে কাল ছুর্ভিক্ষ
এলো সোনার দেশে।

লাঙল গেলো, জমি গেলো
সবই গেলো শেষে ॥
স্বামী পুত্রের হাত ধ'রে মা
এলাম সহরেতে—
ছিলো আশা, ভিক্ষে ক'রে
পাবো রুটি খেতে ॥
(মাগো) পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মরি
ফ্যান্ ফ্যান্ ক'রে ।
ফ্যান দেওয়া দূরে থাকুক
মারতে আসে তেড়ে ॥
কপাল যেদিন ভালো সেদিন
খিচুড়ি একটু পাই ।
স্বামী-পুত্রে দিয়ে মাগো
যেটুক থাকে খাই ॥
(শেষে) কপাল আরো ভাঙলো মাগো
পেটের ব্যামো হ'য়ে—
একটি মাত্র ছেলে আমার
মরলো পথে শুয়ে ॥
স্বামী ছিলো, তা'ও গেলো
মটর চাপা প'ড়ে ।
আমি কেন বেঁচে আছি
এখনও না মরে ॥
পেটের জ্বালায় দিলাম মাগো
পাপের পথে পা ।

তবু মাগো পেটের জ্বালা
আজও গেলো না ॥
ওগো আজ এসেছি, হয়তো মাগো
আর আসবো না।
মরবার আগে পেট ভ'রে ফ্যান্
খেতে দাও গো মা ॥

[ভিখারিণী চলে যেতেই ঐতিহাসিক কলম থামিয়ে কেঁদে উঠলো।]

ঐতিহাসিক।—না, না! আর আমি লিখ্তে পারছি না! আমার হাত কাঁপ্ছে! আমার চোখ সজল হয়ে উঠ্ছে যে! আমার হৃদয় কেঁদে উঠ্ছে যে! হে ঈশ্বর! এ তুমি আমায় কী পরীক্ষা করছো? আমায় কর্তব্য করতে সাহায্য করো।

[পেছনে বাঙালীর প্রবেশ]

বাঙালী।—কী, ঐতিহাসিক? চুপ ক'রে বসে কেন? লেখো। ও কী? তোমার চোখে জল!

ঐতিহাসিক।—বাঙলার এই করুণ কাহিনী আমি আর লিখ্তে পারছি না, বাঙালী।

বাঙালী।—বলো কী? এই তো সবে সুরু। আরো আছে। শক্ত হও।···ঐ দেখো—বাঙলার মহামারী আস্ছে—

[কালো পোষাকে ঢাকা প্রেতাত্মার মতো একজন এলো। নাকিস্বরে বল্তে লাগলো।]

মহামারী।—আঁ আঁমি মহামারী
ছড়াই বাড়ী বাড়ী
যত দুরারোগ্য রোগ।

(জানি) পেটে নেই অন্ন
ভিটে উচ্ছন্ন
ভোগাই তবু দুর্ভোগ ॥
ডাক্তার কবিরাজ
যত খুসী ডাকো আজ
পাবে না ওষুধ কোথাও।
ট্যাকেতে পয়সা নিয়ে
ডাক্তার খানাতে গিয়ে
যতই না ধর্ণা কেন দাও ॥
তাইতো সময় বুঝে
এনেছি অনেক খুঁজে
কলেরা এবং ম্যালেরিয়া।
যতই খুঁজতে থাকো
কুইনিন পাবে নাকো
ভুগে ভুগে যাইবে মরিয়া ॥
বসন্তও সাথে আছে
ঐ আসে পাছে পাছে
লোকালয় করিয়া উজাড়।
এদেশে এসেছি যবে
ছেলে মেয়ে বুড়ো সবে
মোর হাতে হবে ছারখার ॥
(সব) মোর হাতে হবে ছারখার।

[মহামারীর প্রস্থান। ঐতিহাসিক কাঁপা হাতে লিখছিলো। আবার কলম থামালো।]

ঐতিহাসিক।—হে ঈশ্বর! মরা বাঙলার উপর এ খাঁড়ার ঘা দেওয়া কেন? বাঙলাকে এত শাস্তি দিচ্ছো কেন?

বাঙালী।—ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনো লাভ নেই, ঐতিহাসিক। বরং ঐ দেখো মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থের অবস্থা!

[ছেঁড়া জামা ও ছোট্ট একখানি কাপড় পরে একটি লোক এলো।]

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।—লজ্জার মাথা খেয়ে
আমি আজ এখানে
বলবো দু' চার কথা
যাহা কেউ না জানে॥
না বলার কথা, তাই
ঘরে বসে কেঁদেছি
কিছুই হোলো না, দেখে
বলিবারে এসেছি॥
গরীব গৃহস্থ আমি
চাকরীতে দিন চলে
যা, পাই, সব যায়
পোড়া এই পেটে চলে
তার উপব এলো আজ
কাপড়ের অনটন
শুধু ভাবি কবে হবে
বস্ত্রের বণ্টন॥
কপালে নেইকো ঘি
মিছে করি ঠন ঠন্

হলো যাহা নামে তাহা
বস্ত্র-বণ্টন ॥
আজ তাই পরণে
ছেঁড়া জামা ধুতি আধা
আর আধা স্ত্রী পরে
না কোরে দ্বিধা
এ আধা কাপড় খানি
সযতনে তুলে রাখি ।
গামছাটা প'রে হায়
বাড়ীতে লুকিয়ে থাকি ॥
হায়, হায় কি করো ?
খবর পেয়েছি আজ ।
ছোট্ট বোনটি মোর
যার ছিলো অত সাজ ;
ছেঁড়া চট তিনদিন
প'রে শেষে, ও হরি,
শ্বশুর বাড়ীতে সে
দিয়েছে গলায় দড়ি ॥
বস্ত্র-হরণ বুঝি
কলিযুগে দেখা দিলো
মান সম্ভ্রম আজ
তাই, হায়, গেলো গেলো !

[এমন সময় পতাকা হাতে সেই সাহেববেশী লোকটির প্রবেশ এবং সদর্পে চীৎকার ।]

সাহেববেশী ।—জয় জয় হোলো জয়
জয় আমাদের জয়
জয় টোমাডের জয়
আর নেই কোনো ভয়
আর নেই সংশয়
জয় জয় হোলো জয়
শান্টি এসেছে দেশে করগো আনণ্ড।
অভাব ঘুচেছে সব নেই কোনো সণ্ড ॥
ঘরে ঘরে জ্বালো আলো
আজ ডিন বড়ো ভালো
ওই ডেখো, পট পট ওড়ে পতাকা।
এমন ডিনে কি ঘরে যায় গো থাকা ?
জয় আমাডের জয়
জয় টোমাডের জয়
জয় জয় জয় জয় ॥ [প্রস্থান]

[একজন দেশকর্মীর প্রবেশ। পরণে খদ্দরের ধুতি চাদর ; মাথায় গান্ধীটুপী।]

দেশকর্মী ।—হায়রে আমার সোনার বাঙলা
আমাদেরই বাঙলা রে।
যেমন করে পারিস তোরা
বাঁচারে রে এই বাঙলারে ॥

[দেশকর্মী চলে গেলো। ঐতিহাসিক নিজের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।]

বাঙালী ।—কী হোলো ?

ঐতিহাসিক।—[চুপ করে রইলো]

বাঙালী।—[মাথাটা উঁচু কোরে ধরে] উঃ, তোমার চোখে এত জল ? দেখো তো—আমার চোখ কেমন শুক্‌নো।

ঐতিহাসিক।—কেন বলো তো ?

বাঙালী।—কেন ? কেন শুক্‌নো ? কেন শুক্‌নো হয় জানো না ? এ চোখে আর জল নেই—শুকিয়ে গেছে। এখন আর চেষ্টা করেও কাঁদতে পারিনে। পাষাণ হ'য়ে গেছি।

ঐতিহাসিক।—ওগো দুঃখজয়ী বাঙালী,—মরণকে বরণ ক'রে তোমরা অমর হ'য়ে রইলে। আমার চোখের জলে লেখা তোমাদের এই করুণ কাহিনী জীবন্ত হয়ে রইলো—চিরদিনের জন্যে।

বাঙালী।—ওগো ঐতিহাসিক, ওগো সত্যবাদী, ওগো তেরশ পঞ্চাশের শ্মশান বাঙলার অতিথি ! এসো আমাদের শূন্য ঘরে। তোমাকে অভ্যর্থনা করবার মতো কিছু নেই। আজ আমাদের কিছু নেই। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, হাসি নেই, কান্না নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। আছে শুধু ধৈর্য, আছে শুধু আশা, আর আছে রক্তদানের জন্যে লাল টাট্‌কা রক্ত ! এই নিয়ে বেঁচে আছে বাঙালী—বাঙলাকে বাঁচাবে ব'লে, ভারতকে বাঁচাবে ব'লে।

এসো—এসো ঐতিহাসিক, আমাদের বাঙলায়। আরো অনেক কিছু দেখবে এসো। [উভয়ের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

পর্দা আবার উঠ্‌লো।

ভিখারিণীর বেশে মেয়েটিকে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এলো নিশীথ। হাতে তার দু'টি রৌপ্য-পদক। শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করে চীৎকার করে বললো :

'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের সভাপতি মহাশয় এবং আমাদের 'সবুজ-দল' ভিখারিণীর ভূমিকায় হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের জন্যে কুমারী অনুভা রায়কে এই দু'টি রৌপ্য-পদক উপহার দিচ্ছেন।'

কুমারী অনুভা রায়! কোন্ অনুভা? আমাদের অনুভা নাকি!...

অমিয় প্রেক্ষাগৃহ থেকে অতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলো 'ভিখারিণী'কে। দু'টাকার পেছনের সীটে ব'সে এতক্ষণ সে চিনতেই পারেনি 'ভিখারিণী'-বেশে অনুভাকে।

অনুভা অভিনয় করছে—আর অমিয় জান্‌তেও পারেনি তো! আর পরে জানতেও পারতো না—যদি না আস্‌তো এই জলসা দেখতে। অথচ জলসা দেখতে আসাও তার ঠিক ছিলো না।...

'সবুজ দলের'ই এক ছোকরা তার কাকাকে একখানা টিকিট গছিয়ে দিয়েছিলো। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিন্‌তে হয়েছিলো টিকিটখানা। টিকিট কিনলেন—কিন্তু গেলেন না, কী যেন কাজ ছিলো। টিকিট কেনা হোলো অথচ কেউ যাবে না? এটা বড়ো গায়ে লাগে। কাজেই টাকাটা যাতে নষ্ট না হয় তাই কাকার ইচ্ছেয় অমিয় এসেছিলো এই জলসা দেখতে। আর এসে দেখলো, যা' দেখবে ব'লে স্বপ্নেও ভাবেনি। এসে দেখলো অনুভাকে! যে মেয়ে সঙ্গে কেউ না থাকলে পথ চলতে পারতো না, সে মেয়ে একদল ছেলের সঙ্গে করছে অভিনয়!

অমিয় অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলো : এ উন্নতি হোলো কবে থেকে অনুভার? আর, এ অভিনয় তো একদিনে হয়নি। নিশ্চয়ই অনেকবার মহড়া

দিতে হয়েছে। কোথায় হয়েছে—কতদিন ধ'রে হয়েছে—কে জানে? তবে নিশ্চয়ই মাসীমা জানেন। নইলে—যাকে না জানিয়ে এসব করবার সাহস নিশ্চয় অনুভার হবে না!

অমিয় অনেকটা নিশ্চিন্ত হোলো: মাসীমাও এসেছেন তা হোলে অভিনয় দেখতে। অনুভার অভিনয় দেখে খুব ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই তাঁর। তা অনুভা সত্যিই ভালো করেছে। শুনতে শুনতে কান্না পেয়ে যায়।

ওদিকে তখন রঙ্গমঞ্চে সমবেত সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।' ঐতিহাসিক, বাঙালী, সাহেব, মুনাফাখোর, মহামারী, গৃহস্থ, ভিখারিণী-বেশে অনুভা এবং আরো অনেকে গাইছে। শ্রোতৃবর্গও উঠে দাঁড়িয়েছেন—অমিয়ও উঠে দাঁড়ালো। ভালো করে লক্ষ্য করলো ভিখারিণীকে। হ্যাঁ, ঐ তো অনুভা!

মাসীমার সঙ্গে দেখাই ক'রে যাওয়া যাক—ভেবে অমিয় বাইরে এসে মহিলাদের উপর থেকে নামবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো। মেয়েরা সবাই একে একে নামছেন। রঙবেরঙের সাড়ী-ব্লাউজে আর মেয়েদের কলহাস্যে সারা সিঁড়িটা ঝলমল করছে। এমন সময় একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'লে উঠলো: 'এই ত্যাখ ত্যাখ, ঐ মেয়েটা ভিখারিণী সেজেছিলো।'

কথাটা কানে আসতেই অমিয় পেছন ফিরে দেখে—অনুভা সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কাপড় জামা বদলে লাল সাড়ী পরেছে। মুখে পেণ্ট রয়েছে তখনও। মাথার রুক্ষ চুলগুলো ফুলে উঠে বিদ্রোহিণীর রূপ দিয়েছে তাকে। সঙ্গে তার সেই ভদ্রলোক, যিনি মেডেল ঘোষণা করেছিলেন। তারা আরো কাছে আসতে অমিয় শুনতে পেলো—অনুভা ভদ্রলোককে মেডেল দেখিয়ে হেসে বলছে,—'এই নাও তোমার মেডেল। ভিখারিণীর কী হবে ও নিয়ে? বরং একটু ফ্যান্ দাও।' বলেই মেডল-

দুটো নিশীথের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। নিশীথ উত্তরে কী যেন বললে হেসে অনুভার কানের কাছে মুখ নিয়ে। অনুভা শুনে শুধু বললো, 'যাও, তুমি বড় দুষ্টু!'

—'অনুভা!'

অনুভা চমকে চেয়ে দেখলো অমিয়দা দাঁড়িয়ে আছে! অমিয়দা ডেকেছে! অনুভা সংযত হ'য়ে দাঁড়ালো অমিয়র সামনে।

—খুব অবাক হয়ে গেছো না?' অমিয় বললো।

অনুভা চুপ ক'রে রইলো।

—'বড়ো অসময়ে দেখা হ'য়ে গেলো—না?' অমিয় আবার খোঁচা দিলো।

অনুভা বললো: 'জানি না।'

অমিয় জিজ্ঞেস করলো: 'মাসীমা আসেননি?'

—'না।'

—'তুমি এইসব করছো—মাসীমা জানেন?'

—'জানেন!'

—'জানেন?' অমিয় একটু অবাক হোলো।

—'হ্যাঁ, জানেন।' অনুভা জোর দিলো আরো, বললো: 'এতে অবাক হবার কী আছে? এতো ভালো কাজ—দেশের কাজ! আর দেশের কাজ করতে তো আপনিই শিখিয়েছেন প্রথমে। নয় কি?...' ব'লেই হঠাৎ ভয় সঙ্কোচের বাধা ভেঙে কঠিন হ'য়ে অমিয়কে শুনিয়ে নিশীথকে বললো,—'জানেন মিঃ সেন? ইনি হচ্ছেন আমার অমিয়দা। দেশের কাজের প্রথম শিক্ষাগুরু।'

—'আর উনি কে—জানতে পারি কি?' অমিয় বললো।

—'উনি? উনি হচ্ছেন'—অমিয়কে আঘাত করবার জন্যেই অনুভা বললো: 'আমার বন্ধু মিঃ এন্. সেন!'

—'বন্ধু !'

নিশীথ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো, এবার হেসে বললো : 'কেন, মিস রায়ের অমিয়দা, মেয়েদের কি শুধু "দা"ই থাকতে পারে, পুরুষ-বন্ধু থাকতে পারে না ?'

অমিয় গম্ভীর হ'য়ে বললো : 'আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি ; আপনি চুপ করুন।'

—'অল্ রাইট !' নিশীথ বললো : 'ইফ্ ইউ লভ্ এ গার্ল, ইউ মাস্ট লভ হার 'দা' অলসো।'

—'জানেন মিঃ সেন,'—অনুভা মুচ্‌কে হেসে বল্‌লো : 'আপনার অনুরোধে আজ যেমন বুভুক্ষুদের খাওয়াবার জন্যে স্টেজে দাঁড়িয়ে কপট কান্না কাঁদলাম তেমনি ওঁর মন রাখবার জন্যে গোপনে কত রাত্রিই না মসী-যুদ্ধে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেছি। এখন ভাবলে হাসি পায়।'

—'বাঃ অনুভা !' অমিয় বললো : 'তোমার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি ! যাই বলো, এতটা আশা করিনি কিন্তু।'

—'যেটুকু আশা করা যায়, তার বেশি পেলে একটু আশ্চর্য হ'তে হয় বৈ কি !' অনুভা শুকনো হাসলো : 'আর যাকে ঘৃণা করা যায়, অবহেলা করা যায়, তাকে যদি অন্যে জানায় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, তাও চোখে কেমন একটু লাগে বৈ কি !...আসুন মিঃ সেন !'

নিশীথের হাতখানা অনুভা নিজের হাতের মধ্যে সাগ্রহে টেনে নিয়ে বললো : 'চলুন বাইরে যাই।'

যাবার সময় নিশীথ অমিয়কে চোখের ইসারা ক'রে মুচকে হেসে বললো : 'গুডবাই, মিস্ রায়ের পুয়োর অমিয়দা !'

—'শ্যাট আপ।'—ব'লেই অমিয় দাঁড়িয়ে রইলো ওখানে বজ্রাহতের মতো। পাষাণের মতো নিশ্চল হ'য়ে ! অনুভা ! সেই অনুভা !

হায়, হায়, সেই অনুভা! ডাকবো? ফিরিয়ে আনবো ওকে! ও যে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে—উচিৎ নয় কি থামিয়ে দেওয়া?

কয়েক পা এগিয়ে গেলো অমিয়।

—'অনুভা—অনুভা, শোনো!'

নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠলো অমিয়। ছিঃ, ছিঃ, লোকে কী ভাবছে! লোকে এতক্ষণ তাদের কথা শুনে কত কী-ই-না ভেবেছে! ছিঃ ছিঃ!......যাক্—যাকগে চ'লে! আমার কী এতে?

* * *

একটু পরেই ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। রাত্রি তখন ন'টা হবে। একে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার, তার উপর সহসা বৃষ্টি এসে অনুভার আর নিশীথের জামা কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগলো। খানিক চলবার পর—বৃষ্টি যখন আরো একটু জোরে এলো—তারা বাধ্য হয়ে একটা গাড়ীবারান্দার নীচেয় এসে দাঁড়ালো।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানরা বা রিক্সাওয়ালারা বেশ জানে—বৃষ্টির সময় যদি তারা একটু ভিজতে পারে তবে বেশ বেশি ভাড়ায় প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়। খানিক পরেই দরজা-জানালায় খড়খড়ি উঠিয়ে দেওয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঐ গাড়ীবারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো। ছাতা মাথায় কোচোয়ান নিশীথকে লক্ষ্য করে বললো:

—'গাড়ী হবে বাবু?'

এ সুযোগ ছাড়লো না নিশীথ, বললো: 'চলো অনুভা, তোমাকে ঐ গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছে দিই। এ বৃষ্টি কখন থামবে জানিনে।'

—'তাই চলো।'

—'বাদুড় বাগান কেৎনা লেগা?' নিশীথ জিজ্ঞেস করলো।

—'তিন রূপেয়া দিজিয়ে।' কোচোয়ান বললো।

—'দো রূপেয়া হোগা?' নিশীথ বললো।

—'নাহি বাবু।' রাজী হোলো না কোচোয়ান।

অনুভা বললো: 'আচ্ছা চলো। আড়াই রূপেয়া মিলেগা।' নিশীথকে বললো: —'চলো যাই। আর বৃষ্টির মধ্যে দর কষাকষি ক'রে দরকার নেই।'

—'তাই চলো! ভাড়া তো আদায় করবো 'সবুজ দলের' কাছ থেকে।' ব'লেই নিশীথ এগিয়ে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই অনুভা সাড়ীটাকে বাঁ হাত দিয়ে উঁচু করে ধ'রে অতি সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে পা-দানীতে পা দিয়ে ঢুকে গেলো।

নিশীথ তারপর উঠে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘোড়ার গাড়ী চল্‌তে সুরু করলো। ট্রাম লাইনের দু'পাশে সাজানো পাথরের উপর প'ড়ে লোহার পাত-মোড়া চাকা অবিশ্রাম ঘর্ঘর ক'রে গাড়ীটাকে নাচিয়ে নিয়ে চললো। ঘোড়ার ক্ষুরের একটানা শব্দ—খটাখট্, খটাখট্। গাড়ীর ছাদের উপর ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি। অন্ধকার রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোড়ার গাড়ী চললো বাদুড় বাগানের দিকে।

* * *

অনুভাদের বাড়ীর সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো সশব্দে। গলির ভিতরে গাড়ী আসবার শব্দ পেয়ে অনুভার মা কান পেতে রইলেন সদর দরজার কড়া নড়বার আওয়াজ শোনবার জন্যে। অবশ্য সেজন্যে অনুভার মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেননি। কারণ অনুভা বলেই গেছলো—জলসা থেকে ফিরতে প্রায় সাড়ে নটা-দশটা হতে পারে। সত্যিই একটু পরে দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠলো। ঘোড়ার গাড়ী চলে যাবার শব্দ পাওয়া গেলো। অনুভার মা দরজা খুলে দিতেই অনুভা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো। মুখের রং কোথাও আছে, কোথাও নেই। জামা কাপড় অগোছালো। মাকে দেখেই অনুভা যেন আনন্দে উছলে উঠ্‌লো: 'ওমা! তুমি যদি যেতে কী আনন্দই না

হোতো ! আমাদের সঙ্গে যে সব মেয়েরা প্লে করলো, প্রায় সকলেরই মা, ভাই, বোন দেখতে এসেছিলো।'

—'আর এখন বল্‌লে কী হবে ? তখন বললি, ভিখিরীদের সাহায্যের জন্যে নাকি প্লে হচ্ছে—পাঁচ টাকার কম টিকিট নেই। তাই তো গেলাম না।······আর বাড়ী ফেলে যেতামই বা কী ক'রে ?' অনুভার মা বললেন।

অনুভা বললো : 'হ্যাঁ, মা। পাঁচ টাকার, দশ টাকার, পনেরো টাকার, বক্সের সব সীট ভর্তি।' দরজার খিলটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে বললো : 'জানো মা, জানো—আমি দু'টো মেডেল পেয়েছি 'ভিখারিণী'র পার্টের জন্যে। ··ওমা, তাইতো—' অনুভা অপ্রস্তুতে প'ড়ে গেলো—মেডেল তো নিশীথদার পকেটে। আর খেয়াল ক'রে ফেরৎ নেওয়া হয়নি যে ! কাজেই কথাটা ঘুরিয়ে নিতে হোলো : 'মানে—মানে মেডেল দেবে বলেছে। দেয়নি এখনো।'

—'তা, তুই যে এখন সঙ সেজে রঙ মেখেই চলে এলি ? ধোবারও সময় পাসনি ?'

—'কী করবো ? প্লে ভাঙতেই দেরি হোলো একে। কাজেই এই ভাবেই চলে এলাম। অন্ধকারে কে আর দেখছে ?' অনুভা জবাব দিলো।

—'তা তো হোলো। তুই এলি কার সঙ্গে ?' অনুভার মা জিজ্ঞেস করলেন।

—'কেন ? ঐ যে ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েদের পৌঁছে দিচ্ছে এক এক ক'রে।'

বলেই অনুভা সোজা উপরে চলে গেলো। চলে গেলো, বুঝি মাকে এড়াবার জন্যেই। এতো মিথ্যে আর বলা যায় না। এক মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে আর এক মিথ্যে বলা।

—'অনু, কিছু খাবি তো?' অনুভার মা নীচে থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—'না, মা, খেয়ে এসেছি ওখান থেকে।' উপর থেকে অনুভা উত্তর দিলো।

—'কী খেলি?' আবার প্রশ্ন।

—'লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, মিষ্টি।'

অনুভার একথাটা কিন্তু সত্যি।

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অনুভার মনে পড়লো অমিয়র কথা। খুশিতে ভরে উঠলো অনুভা। ঠিক হয়েছে! রীতিমতো অপমান করা হয়েছে অমিয়দাকে। উচিত মতো জবাব দেওয়া হয়েছে। 'ওঃ, ফোঁপর-দালালী করতে এসেছিলো: মা জানেন কিনা?...নিশীথদাকে দেখে হিংসায় নিশ্চয়ই জ্বলে যাচ্ছে। নিশীথদাকে সঙ্গে দেখতে পাওয়াটা খারাপ হোলো নাকি?...ক্ষণেকের জন্যে অনুভার মনটা দমে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে নিলো সে: না, না—ভালোই হয়েছে। জেনে রাখুক অমিয়দা, আমি নেহাৎ অবহেলার পাত্রী নই। আমাকেও লোকে ভালোবাসতে পারে। হ্যাঁ, ভালোবাসতে পারে।... নিশীথদাকে সে সত্যিই ভালোবেসেছে। তার হৃদয় আছে, দরদ আছে, ভালোবাসতে জানে। সে দিতে জানে—নিতেও জানে। আর যে নিতে জানে, তাকে দিয়েও আনন্দ আছে। অনুভা গভীর ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো ভাবাবেশে। পরে ঘরটাকে অন্ধকার ক'রে দিয়ে অনুভা তার ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহটাকে লুটিয়ে দিলো বিছানার ওপর পরম আরামে। পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে মনে মনে বললো: 'ওগো নিশীথদা, তুমি আমার; আমি তোমার! আমায় নাও, আরো নাও, শেষ করে নাও! আমি যে তোমারই জন্যে, প্রিয়তম!'

এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হলো অনুভার : 'ও মা! রুমালটাও তো নিশীথদার কাছে রয়ে গেছে।'

সুগন্ধ-মাখানো ছোট্ট লেডীজ-রুমালটা নিশীথের হাতেই ছিলো। হেসে এসে মাণিক বাবুকে দেখিয়ে একবার শুঁকে নিয়ে সুর করে বললো :

সখী চলে গেলো
ভুলে রেখে গেলো
এই সুবাস রুমালখানি!
এটিকে নিয়ে কী করি এখন, হ্যাঁ, মাণিক বাবু?

মাণিক বাবু হেসে জবাব দিলেন :

ছুঁইয়ে পরাণে
রাখো সযতনে
যেন হয় না কো জানাজানি॥

—নয়—

অমিয় অনুভার জন্যে আর ভাবেনি। এতদিন ভেবেছে চাকরীর জন্যে। তা, যুদ্ধের বাজারে অস্থায়ী সরকারী চাকরী যা হোক একটা জুটে যেতো অমিয়র। কিন্তু অমিয় তা করলো না। আপত্তি : চাকরী মানে গোলামী করার ইচ্ছে তার নেই। তার উপর সরকারের গোলামী করা মানে তো সরকারের সরকারী করা—যার জন্যে দেশটাই উচ্ছন্নে গেল। তা-ও আবার অস্থায়ী চাকরী ; আজ বাদে কাল গলা ধাক্কা দিয়ে বলবে —'বেরোও !' শুধু তাই নয়—খুন্তি-ছেড়ে-কলম-ধরা মেয়েদের মধ্যে বসে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলম চালানো ? ওর চাইতে বরং ওদের ছেড়ে-দেওয়া খুন্তি ধরা ঢের ভালো। তাতে লাভ আছে, আজকাল তো হাতে মারা যাবে না, কাজেই ভাতে মেরে স্বাধীন জেনানাদের কণ্ট্রোলে রাখা যাবে। তা' বটে ! যখন চাল কণ্ট্রোল, ডাল কণ্ট্রোল, তেল কণ্ট্রোল, নুন কণ্ট্রোল, কাপড় কণ্ট্রোল—সব কণ্ট্রোল, তখন হঠাৎ বাইরে বেরুনো মেয়েদের বেহায়াপনা দেখলে তাদেরও তো কণ্ট্রোল করা দরকার··· অমিয়র যুক্তি মন্দ নয়।

তা বলে সত্যিই কিন্তু অমিয় খুন্তি ধরলো না। বরং সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে ধরলো খোন্তা, কর্ণিক, করাত রেঁদা। তার কাকা অবাক হলেন, কাকী গালে হাত দিলেন, আভা শুনে হাঁ হয়ে গেলো। কী ঘেন্না শেষকালে ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে সনাতন কলম না ধরে ছোটলোকদের যন্ত্রপাতি ধরলো ! কাকীমা পুরোনো কথা মনে ক'রে বললেন : 'আমার তো মনে পড়ে অন্নপ্রাশনের সময় অমিয় রূপোর কলম ধরেছিলো। দিদি দেখে কত আনন্দ করেছিলেন। বলেছিলেন : 'দেখিস্, এ-ছেলে জজ্ বা ব্যারিস্টার হবে ! সেই অমিয় শেষে কিনা—'

সেই রূপোর-কলম-ধরা অমিয় শেষে কিনা জজ্ ব্যারিস্টার না হ'য়ে রূপোর জন্য ধরলো ছোটলোকের যন্ত্রপাতি! আর একটি লেখাপড়া জানা বিভ্রান্ত ছেলে অমিয়র সঙ্গে যোগ দিলো—অমিয়র কলেজের সহপাঠী। নাম নির্মল। নিজেদের আঙটি, ঘড়ি বোতাম বিক্রী করে চাঁদনী থেকে কিনে আনলো কর্ণিক, বাঁশলী, গজ, লেভেল, পাইপরেঞ্চ, প্লাইয়ার্স, করাত বাটালী হাতুড়ী, মার্টাম, রেঁদা, তুরপুণ ইত্যাদি। আর কিনলো বিলাতী বইয়ের দোকান থেকে আমেরিকান ৩।৪ খানা বই, যথা: Home Workshop, How to Do and Make Things, Easyway to Build and Repair Buildings and Cottages ইত্যাদি।

সদর রাস্তার উপর একখানা ঘরও ভাড়া করলো। একটা সাইনবোর্ডও ঝোলানো হোলো। লোকে দেখলো তাতে বড়ো বড়ো ক'রে লেখা 'শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান।' তলায় অনেক সব অদ্ভূত কথা লেখা: 'আমরা ভদ্রলোক মিস্ত্রী। নূতন বাড়ী তৈয়ারী ও মেরামত করি। কাঠের নানারূপ কাজ করা হয়। জলের কলের কাজও এখানে হয়। কাজ করাবার জন্য বা পাহারা দেবার জন্য পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

পথ চল্‌তে অনেকেই এই বিজ্ঞপ্তি দেখ্‌লো। সবাই হাসলো। কেউ মুখ টিপে ভদ্রভাবে; কেউ হো হো ক'রে অভদ্র ভাবে। কিন্তু অমিয় আর নির্মল হাসলো না। তারা পালা ক'রে এক একদিন এক একজন বেরিয়ে পথে পথে মিস্ত্রীদের কাজকর্ম দেখতে লাগ্‌লো গভীর মনোযোগ দিয়ে, আর রাত্রে এসে পড়তে লাগলো বইগুলো। যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে নিজেদের বাড়ীর কলের উপর, দেওয়ালের গায়ে, দরজা-জানলায় নানারকম পরীক্ষা চলতে লাগলো। নির্মল স্কুলে পড়বার সময় কাঠের কাজ কিছু শিখেছিলো; কাজেই সে নিলো কাঠের বিভাগ। আর অমিয় নিলো ইঁট সুরকি আর পাইপের বিভাগ।

বিকৃত মস্তিষ্কের অদ্ভূত পরিকল্পনার মতো অমিয়দের এই অদ্ভূত প্রতিষ্ঠান হয়তো একদিন বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যেতো। কিন্তু তা' গেলো না। গেলো না—যারা তাদের ঐ অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি দেখে হেসেছিলো তাদেরই সহযোগিতার জন্যে! একদিন তাদেরই একজন ছুটে এলেন: 'মশায়, আমার দরজার হুড়কো হঠাৎ ভেঙে গেছে। জানলার একটা কবজাও ভেঙে গেছে। একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?'

—'নিশ্চয়ই।' অমিয় বল্‌লো: 'আপনি নাম ঠিকানা দিয়ে যান। এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।'

অমিয় নাম ঠিকানা লিখে রাখলো। একটু পরেই নির্মল আসতেই একলাফে উঠে দাঁড়ালো অমিয়:

—'ভয় নাই, ওরে নাই ভয়। হবে জয়।'

—'হঠাৎ কেন এত অভয়?' নির্মল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

অমিয় বললো: 'এসেছেন তিনি এসেছেন। তোকে আমন্ত্রণ ক'রে গেছেন।'

নির্মল এবার অবাক হোলো। বললো: 'কে এসেছিলেন? কিসের আমন্ত্রণ?'

'আমাদের প্রথম খদ্দের এসেছিলেন। তোকে দরজা জানলা মেরামতের আমন্ত্রণ ক'রে গেছেন।' অমিয় নাম ঠিকানা দেখালো: 'এই ঠিকানায় যেতে হবে এখুনি কব্জা আর দু'তিন সাইজের স্ক্রু নিয়ে, যা এখুনি।'

নির্মল এক গাল হেসে পরম উৎসাহে তার যন্ত্রপাতি ভরা সুটকেশটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু যে বাড়ীতে কাজ করতে গেলো সে বাড়ীর মেয়েরা গেলো অবাক হয়ে। ওমা! এ আবার কেমন মিস্ত্রী! লজ্জায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো: এ যে ভদ্রলোক! সার্ট, প্যান্ট জুতো পরা, চোখে চশমা, এ কেমনতর মিস্ত্রী? তারা দরজা-জানলার ফাঁক

দিয়ে দেখতে লাগলো, বাড়ীর কর্তা যে কাজগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো ভদ্রলোক মিস্ত্রী এক মনে করে যাচ্ছে। গা ঘেমে সার্ট ভিজে গেছে ; কপাল থেকে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে ঝ'রে। বাড়ীর গিন্নী বললেন : 'আহা, কার বাছা দু'টো পয়সার জন্যে এমন ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে ?' কাজ হ'য়ে গেলো। মজুরী ও জিনিষের ন্যায্য দাম নিয়ে নির্মল চলে গেলো। গিন্নী বেরিয়ে এসে কর্তাকে বললেন : 'এমন সোনার চাঁদ সব ছেলেরা গোলামী না ক'রে এই সব স্বাধীন ব্যবসা করছে নাকি আজকাল ? দেখে মায়াও হোলো, আনন্দও হোলো। এবার থেকে এ সব কাজের জন্যে এদেরই ডেকো।'

এই ভাবে আর একদিন আর এক বাড়ীতে অমিয়র ডাক এলো। অমিয় পাড়ার একটি অনাথা বিধবার একটি ১২ বছরের ও একটি ১৪ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন ধ'রে একটা বাড়ী মেরামত ও চুনকাম করলো। পাড়ার ছেলেদুটি মজুরী পেলো, কাজেই উৎসাহ পেলো : তাদের মা ভাবতেও পারেননি তাঁর মূর্খ ছেলেরা এভাবে টাকা আনতে পারবে। অমিয় তাদের সিমেণ্ট বালি মেশাবার ভাগ, কায়দা বুঝিয়ে দিয়েছিলো। তারা বেশ সহজেই সে সব বুঝে নিয়ে চটপট কাজ করে গেলো অমিয়র সঙ্গে।

ক্রমেই এই অদ্ভুত শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের খবর আশে পাশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। যারা একবার এদের ডেকেছিলো তারা এদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আবার ডাক্‌লো। আবার তাদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা শুনে অন্য অনেকেও ডাকলো। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেলো চারিদিকেই ডাকাডাকি। কাজেই আরো লোকের দরকার হোলো। অমিয় অভাব অনটনের বহু সংসার থেকে কার্যক্ষম ছেলেদের নিয়ে এলো নিজেদের সাহায্যের জন্যে। তাদের নানা রকম কাজ শেখানো হতে লাগলো। তাদের নাম ঠিকানা খাতায় লিখে রাখা হোলো। যারা যে কাজ জানে

তাদের সেই কাজে পালা করে ডাকা হ'তে লাগলো। কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে পয়সা পাচ্ছে দেখে তাদের উৎসাহ বেড়ে যেতে লাগলো; অভিভাবকরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের যেন দিন দিন উন্নতি হয়।

একদিন অমিয় সবাইকে ডেকে প্রস্তাব করলো: 'প্রতিষ্ঠানে অনেক ছেলে হ'য়ে গেছে। এত ছেলেকে কাজ দেবার মতো অত কাজ নেই। অথচ ঐ সব ছেলেদের টাকার দরকার এবং প্রতিষ্ঠানেরও টাকার দরকার। কাজেই একটা নতুন জায়গা নেওয়া হোক্ কার্যালয়ের জন্যে। সেখানে মাসিক একটাকা করে চাঁদা দিয়ে ছেলেরা ঐ কার্যালয়ের সদস্য হবে। ছেলেরা যারা যে কাজ জানে তারা সেই সব কাজ করবে। অবশ্য এ কাজ হবে একটু অন্য ধরণের। কাঠের কাজ যে সব ছেলেরা জানে তারা কাঠের খেলনা তৈরি করুক। যারা বাড়ীর কাজ করেছে তারা মাটি আর রঙ দিয়ে আধুনিক ডিজাইনের বাড়ীর ছোট ছোট মডেল তৈরি করুক বিক্রীর জন্যে। এ ছাড়া টিনের ও কাঠের খেলনা করুক কেউ, ন্যাকড়ার পুতুল কেউ করুক। বর্তমান যুদ্ধে জাপান থেকে পুতুল আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে। এই সব পুতুল এখন বাজারে ভালো দামে বিক্রী হবে। এই প্রতিষ্ঠান সেই সব জিনিষ দোকানে দোকানে বাড়ীতে বাড়ীতে কিংবা প্রদর্শনীতে বিক্রীর ব্যবস্থা করবে। যার জিনিষ যে দামে বিক্রী হবে তার তিনভাগ সে পাবে এবং একভাগ পাবে এই প্রতিষ্ঠান। আশা করি এই প্রস্তাবে কারো কোনো আপত্তি নেই।'

সকলেই সমস্বরে বল্‌লো: 'এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করছি।'

নির্মল প্রশ্ন করলো: 'আমাদের বাইরে গিয়ে কাজ করবার ব্যবস্থার কী হবে?'

—'কী আবার হবে?' অমিয় বললো: 'যেমন চল্‌ছে তেমনিই চল্‌বে। এই out-door service-এই আমাদের নাম হয়েছে এবং আরো

যাতে ভালোভাবে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্যে দু'একটা নিয়ম করাও দরকার হ'য়ে পড়েছে। কার্যালয়ের নিয়মের মতো বাহিরের কাজে যারা থাকবে তারাও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবার জন্যে প্রতিমাসে একটাকা করে চাঁদা দেবে এবং বাইরে কাজ করে যে-টাকা মজুরী পাবে তা থেকে তিনভাগ সে নেবে এবং একভাগ প্রতিষ্ঠানে দেবে। অনেকে হয়তো বলবে, কষ্ট করে আনা পয়সা প্রতিষ্ঠানকে কেন দেবো? এর উত্তর হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানকে যদি বাঁচিয়ে না রাখো তবে আমরা কেউই বাঁচবো না। আর প্রতিষ্ঠান যদি বাঁচে তবে তোমাদের সকলেরই বিপদে আপদে এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারবে—ডাক্তার ঔষধ দিয়ে কিংবা টাকা ধার দিয়ে। শুধু তাই নয়, এই প্রতিষ্ঠানের একটা লাইব্রেরী থাকা দরকার। তাতে গৃহনির্মাণ, কাঠের কাজ, প্লাম্বারিংয়ের ও কুটিরশিল্পের নানা রকমের আধুনিক বই ও পত্রিকা থাকবে পড়বার জন্যে। একটা টেলিফোনও বিশেষ দরকার। এ ছাড়া আরো নানা রকম বিভাগ খুলতে হবে।' অমিয় বলে চল্‌লো। আবেগে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। মুষ্টিবদ্ধ ডান-হাতখানা তার কথার তালে তালে ওঠা নামা করছে: 'এই প্রতিষ্ঠানকে আরো বাড়াতে হবে। যেমন, লণ্ড্রীর কাজ করতে হবে। তবে যে ধরণের সব লণ্ড্রী এখন চল্‌ছে ও ধরণের নয়। ও তো কাপড় জামা নিয়ে ধোপাকে দিয়ে কাচিয়ে খদ্দেরকে দেওয়া। লাভের গুড় ধোপাতেই খায়। লণ্ড্রীওয়ালার যেটুকু থাকে তা ক্যাশমেমো বই ছাপাতে, ঘর ভাড়া দিতে আর কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিতেই বেরিয়ে যায়। আমাদের এই লণ্ড্রীর কাপড় নিজেরা কাচ্‌বো, ইস্ত্রি করবো; প্রথমে হাতে কর্‌বো; পরে কিছু টাকা জম্‌লে কাপড় কাচা কল কিনে কাজ চালাবো। সেই সঙ্গে ডাইং এবং শাল রিপেয়ারিংয়ের কাজ এবং গরম জামা কাপড়ের পেট্রল-ওয়াশিংও আমরা করবো।

আরো আছে। ক্রমে আমরা জুতো মেরামতি ও পালিশের বিভাগ

খুলবো। তা' বলে ভেবো না—যন্ত্রপাতি কাঁধে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় 'ভূস' 'ভূস' ক'রে বেড়াতে হবে। একখানা বড়ো ঘর ভাড়া করা হবে। তাতে কতকগুলো চেয়ার থাকবে এবং পা রাখবার ছোট ছোট প্ল্যাটফর্ম থাকবে। যতগুলো চেয়ার থাকবে ততগুলো ছোট ছেলে থাকবে। ভদ্রলোকেরা আস্‌বেন, চেয়ারে বস্‌বেন; ছেলেরা তাদের জুতো বুরুশ করতে থাকবে এবং ভদ্রলোকদের ততক্ষণ সময় কাটাবার জন্যে তাঁদের হাতে দিতে হবে নানা রকমের ছবির বই বা পত্রিকা। যে ছেলে দিনের শেষে যা উপায় করবে তার চারভাগের একভাগ দেবে প্রতিষ্ঠানকে। এখানেও সদস্য হ'তে হবে মাসিক এক টাকা দিয়ে। আর হ্যাঁ, এদের উপরে থাকবে একজন যে মেরামতি জুতো নেবে এবং কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে মেরামতের পর ফেরৎ দিয়ে টাকা নেবে। শুনেছি আমেরিকায় এই রকম সব দোকান আছে।'

—'চমৎকার আইডিয়া!' নির্মল বল্‌লো।

—'এখনো শেষ হয়নি, নির্মল।' অমিয় বললো: 'আমার অনেক আশা। সে আশা সফল করবার ভার আমার এই সব ভাইদের উপর!··· ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে খবরের কাগজ বিলি করবার জন্যে একটা বিভাগ খুলবে।···আর একটা বিভাগ খুলতে হবে যা এদেশে সম্পূর্ণ নতুন। শুনেছি জাপানে আছে। সেটা হচ্ছে ঝি-চাকর, ঠাকুর-রাঁধুনি সরবরাহ-বিভাগ। কথাটা খুব আশ্চর্য লাগছে—না? বিষয়টা খুলে বলা দরকার। সকলেরই জানা আছে প্রত্যেক বাড়ীতেই ঝি চাকর, ঠাকুর রাঁধুনি দরকার। অথচ সহজে নতুন লোক রাখা যায় না—যতক্ষণ না সেই লোকের পরিচিত কেউ তার সততার জন্যে দায়ী হ'তে স্বীকার না হয়।···আমরা আমাদের পরিচিত কতকগুলি ঝি-চাকর, ঠাকুর-রাঁধুনির নাম ঠিকানা আমাদের এই বিভাগের খাতায় রেখে দেবো। তারা এই প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগের সদস্য হবে। যদি কোনো

গৃহস্থ আমাদের কাছে কোনো লোক চান তবে কাজ হিসাবে মাইনে ঠিক ক'রে লোক দেবো। ঐ লোক কাজে বহাল হবার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে টাকা পিছু দু' আনা হিসাবে দিয়ে যাবে যতদিন কাজ করবে। এবং গৃহস্থ ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠানকে supplying charge হিসাবে দশ টাকা নগদ দেবে। আর, আর আমরা ঐ লোকের সততার জন্যে দায়ী থাকবো, এবং যত টাকা মাইনে তার তিনগুণ টাকার জিনিষ যদি গৃহস্থ সাবধান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের লোক চুরি করে তবে সে টাকা আমরা অনুসন্ধানের পর দিতে বাধ্য থাকবো। এই বিভাগে আমাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিশ্বাসী লোক পেলে এই ব্যবস্থায় আমাদের প্রতিষ্ঠান লাভবান হতে পারে। ঐ সব ঝি-চাকর-ঠাকুর-রাঁধুনি তাদের মাইনে আমাদের কাছে জমা রাখবে এবং অন্তত ২৫৲ টাকা সব সময়েই আমাদের কাছে থাকবে। তাতে তাদের টাকা জমাবার অভ্যাস হবে এবং কোনো বাড়ীতে গিয়ে চুরি করতে সাহস পাবে না। কারণ তাদের টাকা আমাদের কাছে জমা রইলো। এখন প্রশ্ন হ'লো ঐ সব অশিক্ষিত লোকেরা এ সবের মধ্যে যাবে কেন? যাবে—যদি দেখে এতে তাদের উপকার হচ্ছে, অপকার হচ্ছে না। যেমন অসুখ হোলে এই প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার তাকে বিনা ভিজিটে দেখবে। ঔষধের অর্দ্ধেক দাম প্রতিষ্ঠান দেবে। দেশে চিঠিপত্র লেখা, মনি অর্ডার লেখাতে প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাবে। যখন চাকরী থাকবে না তখন তার ঐ জমা রাখা ২৫৲ টাকা থেকে দৈনিক খাওয়া খরচ পাবে। তবে আবার কাজ পেলে ঐ ২৫৲ টাকা আবার পুরিয়ে রাখতে হবে।'

একটু থেমে অমিয় বল্‌লো: 'আশা করি আমার এই সব পরিকল্পনা স্বপ্নবিলাসী রঙিন স্বপ্নের মতো বিলীন হ'য়ে যাবে না। একদিন না একদিন তা' বাস্তবে পরিণত হবে।

অমিয় ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বল্‌লো : 'আমার এই প্রস্তাবের বিষয়ে যে কেউ তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারে।...কারো কিছু বলবার আছে ?'

—'আমার একটি কথা বলবার আছে।' একটি ছেলে ঘরের এককোণ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো।

—'বলো।' অমিয় অনুমতি করলো।

—'জুতো মেরামতি ও পালিশ বিভাগের ছেলেরা কি নানা জাতের লোকের জুতো পালিশ করতে চাইবে ?' ছেলেটি প্রশ্ন করলো।

—'যে চাইবে না' অমিয় জবাব দিলো : 'তাকে আমরাও চাই না। যে মিথ্যে মান ক'রে থাকবে, বুভুক্ষা থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের নয়—তার নিজের। অভাবে পড়ে চুরি ক'রে লুকিয়ে থাকার চাইতে কি পরের জুতো পালিশ ক'রে ট্যাঁকে পয়সা গুঁজে বুক ফুলিয়ে রাস্তা চলা বেশি কাম্য নয় ?'

ছেলেটি বুঝলো। আর প্রশ্ন না ক'রে বসে পড়লো। আর একটি ছেলে উঠে বললো : 'আমার মনে হয়, ঝি চাকর সরবরাহ-বিভাগে প্রতিষ্ঠানের লাভের চাইতে লোকসান হবে বেশি।'

অমিয় উত্তর দিলো : 'এই বিভাগ খোলবার আগে আরো আমাদের ভাবতে হবে। দেখতে হবে লোকেরা এ ধরণের service চায় কি না। যদি চায় তবে এ কাজে হাত দিয়ে কিছুদিন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো যেতে পারে। জেনে রেখো : no risk no gain.'

ছেলেটি আর কিছু না ব'লে বসলো।

আর একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো :

—'আমি একটি বিশেষ খবর এখানে প্রকাশ্যে বলতে চাই।'

—'বলো।' অমিয় বললো

—'আমাদেরই একজন এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে ঠিক করেছে।'

—'ক্ষতি কী তাতে ?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

'কেন ? প্রতিষ্ঠানের বাইরে যদি কমপিটিটর জোটে তবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে না ?'

—'না, হবে না! আচ্ছা বলো, কে সে ছেলে ?'

আর একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো :

—'আমি।'

—'তুমি এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে চাও ?'

—'হ্যাঁ!'

—'কেন ?'

—'সংসার চালাবার জন্যে আমার আরো টাকার দরকার। সেজন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে বেশি টাকা উপায় করতে চাই।'

—'তুমি পারবে ?'

—'আপনার আশীর্বাদে যা কাজ শিখেছি তাতে পারবো ব'লেই মনে করি।'

'তোমার যে আত্মবিশ্বাস জন্মেছে সেজন্যে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আমি চাই তোমারই মতো ছেলে। আমি চাই এইভাবে ছেলেরা তৈরি হোক; নিজের পায়ে দাঁড়াক। ছড়িয়ে যাক পাড়ায় পাড়ায়, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ব্যবসা করতে বসেনি; বরং বাঙালী যাতে বাঙলায় একচেটিয়া কাজ করতে পারে, সেই শিক্ষাই দেবে এই প্রতিষ্ঠান।···আর নির্মল, এক কাজ করা যাক—কাল এর কাজ পরীক্ষা করে একে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া যাক, এবং পরশু সভা ক'রে একে আমরা বিদায়-সম্ভাষণ জানাবো।'

—'বেশ !' নির্মল বললো।

—'তুমি ব'সো।' অমিয়র অনুমতি পেয়ে বিদায়প্রার্থী ছেলেটি বসলো। অমিয় তখন অভিযোগকারী ছেলেটিকে বললো : 'তুমিও বসো। তুমি এই প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্যে ভাবো দেখে খুসী হ'লাম। তবে জেনে রাখো এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভালোই হবে। আরো নাম হবে—আরো ছেলে পাবো আমরা।...আচ্ছা, আজকের মতো এইখানেই শেষ করি আমরা।'

সবাই চলে গেলে নির্মল বললো অমিয়কে—'এ সব প্ল্যান তো ভালো নয়।'

—'কেন ?' অমিয় অবাক হ'লো।

—'এ তো দেখছি অ-বাঙালীর অন্ন-সংহার-ব্যবস্থা।'

হেসে বললো অমিয় : 'অবাঙালীর অন্ন-সংহার-ব্যবস্থা কিনা জানিনে, তবে বাঙালীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা এতে হবে...আমি ব'লে দিচ্ছি !... আরো অনেক ব্যবস্থা আছে, ভাই, মাথায়—সে সব ক্রমশ প্রকাশ্য !'

—'যথা ?'

'এই যেমন গাড়ী-বিভাগ খোলা হবে আমাদের। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, ঠেলা বা গোরুর গাড়ী চালাবে। ঐ সব গাড়ী প্রতিষ্ঠানের টাকা থেকে কেনা হবে।...কী, ভালো নয় এ কাজ ?'

—'ভালো, তবে অবিশ্বাস্য।'

—'তবে শুনেও আর দরকার নেই।' অমিয় হাসলো : 'যার আত্ম-বিশ্বাস নেই, সে কিছুই বিশ্বাস করে না।...আর সব প্ল্যান বলবোই বা কেন ? আমি সব business secret বলি, আর তুমি এই ধরণের আর একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া ক'রে আমাদের অন্ন-সংহার করো আর কী ?

দু'জনেই হেসে উঠলো।

—দশ—

যুদ্ধের বাজারে সময় মন্দ কাটতে লাগলো না। মন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট আর ডিক্টেটররা গরম গরম বক্তৃতা দিলেন। সৈন্যেরা যুদ্ধ করলো, মানে, মারলো এবং মরলো। যারা বোকা তারা এই পৃথিবী থেকে স'রে গেলো। যারা চালাক তারা তাদের জায়গা দখল করলো। কেউ রোগা হোলো, কেউ মোটা হোলো। কেউ একটু ফ্যানও পেলো না, আবার কারো গুদামে জমা থাকলো ভর্তি চাল। যার পকেটে আগে পাঁচটা টাকাও থাকতো না—ব্যাঙ্কে তার জমা হোলো পাঁচ লাখ টাকা। আগে যার পকেটে বাসে ট্রামে চড়বার মতো পয়সাও থাকতো না, সে এখন মটর চেপে পথচারীদের গায়ে কাদা ছড়াতে লাগলো। আবার অনেক পথচারী বিশেষ ধরণের লরী চাপা পড়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে চিত্রগুপ্তের সামনে হাজির হোলো। মাঝে মাঝে সাইরেনের করুণ কান্না আকাশ বাতাসকে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো। লোকেরা প্রাণভয়ে যে যেখানে পারলো লুকোলো।

আসলে যুদ্ধের বাজারে আমাদের ছোট বেলাকার লুকোচুরি খেলা চলতে লাগলো যেখানে সেখানে। রাজনীতিবিদ্‌রা সংবাদ লুকোলো; সৈন্যেরা ঝোপে লুকোলো; ব্যবসায়ীরা জিনিষ লুকোলো; ব্ল্যাক আউটে সহর লুকোলো; সহরবাসীরা শেল্‌টারে লুকোলো। আর লুকোলো গিন্নীরা কর্তাদের পকেট থেকে কাগজের টাকা। আর অফিসে কাজ করতে বেরিয়ে অনেক কুমারীরা খেললো লুকোচুরি খেলা সহকর্মীদের সঙ্গে।

কামনার লুকোচুরি খেলায় বোকা মেয়ে অনুভা শিকারী নিশীথের কাছে ধরা পড়ে গেলো। প্রেমের লুকোচুরি খেলায় আভার কাছে ধরা

দিলো তার স্বামী। অনুভা মদিরা দিয়ে মত্ত করলো নিশীথকে। আভা মধুময় করলো তার স্বামীর সংসারকে। নানা আশঙ্কায় অনুভা নিশীথকেবাঁধবার চেষ্টা করলো। মায়ার বাঁধনে আভা নিজেই বাঁধা পড়লো সংসারে। বাঁধনছেঁড়া অমিয় কিন্তু কোনো বাঁধনেই বাঁধা পড়লো না। বরং তার প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে যে একবার এলো সেই পড়লো বাঁধা। শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি হ'তে লাগলো। অমিয়র পরিকল্পিত অনেকগুলি বিভাগ খোলা হোলো। এই নতুন ধরণের প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আশ্চর্য, লীনা কিন্তু এসব খবর জানতোনা। জানবেই বা কী ক'রে? অমিয় বহুদিন ওদের বাড়ী যায়নি; আর লীনারও কেন যেন মনে মনে অমিয়দার বিষয়ে কেমন এক রকমের সঙ্কোচ, জড়তা, লজ্জা এসে প'ড়েছে। তাই ইচ্ছে হোলেও অমিয়দার খবর নিতে পারেনি। বোধ-হয় আভার ফুলশয্যার দিন অনুভার ব্যঙ্গোক্তি থেকেই লীনা জড়িয়ে গেছে লজ্জায়!

কিন্তু কখন যে কী করে কার সঙ্গে কার দেখা হ'য়ে যায় ঠিক নেই। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটা বাড়ীর গঙ্গাজলের পাইপ বন্ধ হ'য়ে গেলো আর সেইজন্য দেখা হয়ে গেলো লীনার সঙ্গে অমিয়র! এমন যে হবে, অমিয়ও ভাবেনি, লীনাও ভাবেনি।

শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের টেলিফোনে খবর আসতে যন্ত্রপাতি নিয়ে অমিয় গেছলো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ীটার গঙ্গাজলের পাইপ ঠিক করতে। ট্যাঙ্কের বল ভাল্‌ব ঠিক করে দিয়ে পায়খানায় ঢুকে জলের সিস্‌টার্ণ ঠিক করে দিলো। কাজ শেষ ক'রে যন্ত্রহাতে বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখে সামনে লীনা দাঁড়িয়ে।

—'লীনা!'

—'অমিয়দা আপনি !'

দুজনেই অবাক হ'য়ে গেলো। বেশি অবাক হোলো বুঝি লীনা। বললো : 'এ কী ! যন্ত্রপাতি হাতে ? এই বেশে ? এ কী কাণ্ড ?'

খাকী হাফ প্যাণ্ট সার্ট পরা অমিয় হেসে বললো : 'আর যে কাণ্ডই হোক্ লঙ্কাকাণ্ড নয় নিশ্চয়ই। নইলে দেখতে ল্যাজে ক'রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি বাড়ীতে।

এমন সময় লীনার বয়সী একটি মেয়ে নীচের নেমে এসে বললো :

—'ওমা, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস্? মিস্ত্রীর সঙ্গে ?'

—'দেখুন তো !' অমিয় হেসে বললো : 'একটা ছোটোলোক মিস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। লজ্জা ঘেন্না কিছুই নেই।'

—'আরে, ও আমাদের অমিয়দা !' লীনা বুঝালো মেয়েটিকে। মেয়েটি কী বুঝলো সেই জানে। বাঁকা হাসি হেসে বললো :

—'তা, তোদের অমিয়দার কপালে একটা চাকরীও জোটেনি ?'

—'আমিও তো সেই কথা-ই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম !' ··লীনা বললো : 'হ্যাঁ, অমিয়দা, ব্যাপার কী বলুন তো ?'

—'ব্যাপার আবার কী ?' অমিয় বললো : 'বিদ্যে কৈ যে কলম ধরবো ? তাইতো যন্ত্র ধরেছি !'

—'কী যে বলেন !' লীনা বললো : বি. এ. পাশের পেটে যদি বিদ্যে না থাকে তো—'

কথা শেষ হ'তে দিলো না মেয়েটি। একরকম আঁৎকেই উঠলো 'বি. এ. পাশ !'

—'হ্যাঁ রে !' লীনা বললো।

'ভুল করছো লীনা।' অমিয় বললো : 'বি. এ. পাশের পেটে বিদ্যে থাকতে পারে হয়তো। কিন্তু পেটে ভাত থাকে না যে !'

মেয়েটি এবার অমিয়কে বললো :

—'তা-বলে যন্ত্রপাতি নিয়ে মিস্ত্রী সাজতে হবে ?'

—'ক্ষতি কী ?' অমিয় বললো : 'চুরি করার চাইতে তো ভালো।'

লীনা জিজ্ঞেস করলো : 'এই করে আপনার চলে ?'

—'শুধু এই-ই নয়,' অমিয় বললো : 'আরো আছে অনেক রকম কাজ। আর এই সব করে শুধু আমারই চলে না—আমার মতো আরো অনেকেরই চলছে।'

—'তার মানে ?' লীনা আরো অবাক হোলো।

—'কেন, শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের নাম শোনোনি ?'

—'না তো !' লীনা বললো।

—'তোমরা বালিগঞ্জের দিকে আছো, তাই এর খবর পাওনি। আমরা শিগ্গীই ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলবো।'

মেয়েটি বললো : 'ঐ শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানেই বুঝি বাবা মিস্ত্রীর জন্যে টেলিফোন কোরেছিলেন ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর অমনি বুঝি আপনি মিস্ত্রী এসে হাজির ?' লীনা বললো।

—'কেন ?' অমিয় নিজের চেহারা দেখিয়ে হেসে বললো : 'মিস্ত্রী ব'লে চেনা যাচ্ছে না নাকি ? ভদ্রলোক ব'লে বোঝা গেলেই তো মুস্কিল। হ্যাঁ, লীনা, তাতে যে লোকে মানই দেবে—কাজ দেবে না কেউ।'

—'দেবে।' লীনা গম্ভীর হ'য়ে চোখদুটি অমিয়র উপর রেখে ধীরে ধীরে বললো : 'লোকে আপনাদের মানও দেবে, কাজও দেবে। আচ্ছা, আপনাদের শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান কোথায় ? কতজন কাজ করে ?'

—'দেখতে চাও ?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

—'দেখতে যাবি পারুল ?' মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো লীনা। পারুল বললো: 'না, ভাই, আমার কাজ আছে। আর ওসব দেখেই বা কী হবে ? বরং আমি ওপরে যাই—কাজ আছে।' বলেই মেয়েটি ওপরে চলে গেলো।

অমিয় হেসে বললো : 'আহা, মেয়েটি বড়ো আঘাত পেয়েছে মনে !'

লীনা জিজ্ঞেস করলো : 'কেন ?'

—'এই আমার মতো ভদ্রলোক মিস্ত্রী দেখে। ভদ্রলোককে এতদিন কলম ধরতেই দেখেছে—যন্ত্র ধরতে দেখেনি তো। ওকে সান্ত্বনা দিয়ো।'

—'দেবো'—লীনা হাসলো।

—'মেয়েটি কে লীনা ?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো : 'আর তুমিই বা এখানে কেন ?'

লীনা বললো : 'ও আমার পিস্‌তুতো বোন পারুল। এটা আমার পিসীমার বাড়ী। বাবা পৌঁছে দিয়ে গেছেন—একটু পরে এসে নিয়ে যাবেন।'

—'মাসীমা আসেন নি ?'

—'না। বাড়ীতে একজন কারো থাকার দরকার তো।'

এমন সময় বাইরে ললিতবাবুর গলা শোনা গেলো : 'লীনা, লীনা ! মানে, পারুল, পারুল !—কোথায় সব ?'

—'ঐ যে, বাবা এসেছেন,' ব'লে লীনা গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

ললিতবাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকেই অমিয়কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন : 'আরে—অমিয় ? মানে, তুমি এখানে ? হাতে যন্তর ? মানে ?'

লীনা বললো : 'অমিয়দা ট্যাঙ্ক সারাতে এসেছিলেন ?'

—'তার মানে ?' ললিবাবু বিস্মিত হ'লেন আরো : 'অমিয় ট্যাঙ্ক সারাবে মানে—কেন ? মানে, মিস্ত্রী নেই নাকি সহরে ? মানে, আমি তো কিছুই বুঝছিনে এর মানে।'

—'তোমাকে বুঝতেও হবে না। তুমি ওপরে চলো।' লীনা ললিতবাবুকে ঠেলে দিলো সিঁড়ির দিকে।

অমিয় হেসে বললো : 'মেশোমশাই, ভালো আছেন তো ?'

—'তা তো আছি।' ললিতবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন : 'কিন্তু তুমি—মানে, যন্তর—'

ললিতবাবুকে কথা শেষ করতে দিলো না লীনা : 'তুমি চলো তো এখন ওপরে। পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে নিয়ে চলো যাই অমিয়দাদের শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান দেখ্‌তে।'

—'সে আবার কী ?' ললিতবাবু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লেন : 'মানে কার প্রতিষ্ঠান, হ্যাঁ, অমিয় ?'

—'এই. আমাদেরই !' অমিয় বললো।

—'সে পরে বুঝবে।' বলেই লীনা সিঁড়ি বেয়ে ললিতবাবুর চাইতে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে উপর দিকে টানলো : 'এখন এসো, ওপরে এসো।'

এমন সময় সিঁড়ির অর্দ্ধেক পথে নেমে এলো পারুল। ডাকলো : 'আসুন মামাবাবু—ওপরে আসুন। মা ডাকছেন।'

—'চলো, মা, যাই।' ললিতবাবু ওপরে গেলেন।

—'একটু দাঁড়ান, অমিয়দা—আসছি।' ব'লে লীনাও ওপরে গেলো।

পারুলও ওপরে চলে যাচ্ছিল এমন সময় অমিয় সিঁড়ির নীচে থেকে ডাকলো :

—'আপনি একটু শুনে যাবেন তো ?'

পারুল রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালো :

—'বলুন !'

—'আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, ইচ্ছে করেন তো দেখে নিতে পারেন।'

—'এখন কে ঐ সব জায়গায় ঢুকবে ?'

—'বেশ ! পরে দেখবেন। যদি কোনো দোষ থাকে জানাবেন—ঠিক ক'রে দিয়ে যাবো। আর আমাদের টাকাটা দিন—সাড়ে চার টাকা।

এই নিন রসিদ।' বলেই অমিয় পকেট থেকে একটা ছোটো রসিদ-বই আর পেন্সিল বার করে কার্বন পেপার লাগিয়ে লিখে এক কপি ছিঁড়ে পারুলের হাতে দিলো: 'এসে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দর-দস্তুর ক'রে নিতে পারিনি। তবে ন্যায্য মজুরীই নিচ্ছি। আপনার বাবার যদি আপত্তি থাকে, খবর দেন যেন আমাদের অফিসে!'

'অফিস' কথাটা শুনে পারুল মনে মনে হাসলো। মিস্ত্রীর আবার অফিস! সখও কম নয়! মুখে বললো: 'আচ্ছা দাঁড়ান,—টাকা এনে দিচ্ছি।'

পারুল ওপরে চলে গেলো। অমিয় বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

—'হ্যাঁ, দাদা, এসব আবার কী?' ললিতবাবুর বোন ওদিকে উপরে প্রশ্নবান ছাড়তে লাগলেন: 'নীচেয় যে মিস্ত্রী কাজ করছে সে নাকি বি. এ. পাশ? লীনা নাকি চেনে ওকে? পারুলের মুখে শুনে তো অবাক।'

—'ও তো, মানে অমিয়?' ললিতবাবু বললেন: 'ভদ্রঘরের ছেলে, মানে, ও আমাদের অমিয়!'

—'তা, ছোটলোকের মতো যন্তর নিয়ে বাড়ী বাড়ী বেড়াচ্ছে কেন?' ললিতবাবুর বোন জিজ্ঞেস করলেন।

—'মানে, তা তো জানি নে!'

লীনা এ প্রসঙ্গ থামিয়ে দিলো। বললো: 'পিসীমা, আমরা যাই। দেরি হ'য়ে গেলে মা আবার ভাববেন।'

—'দাঁড়া, দাঁড়া! চা টা করি দাদার জন্যে। পারুল আবার কোথায় গেলো।···অ পারুল!'

লীনা বাধা দিলো: 'থাক্, পিসীমা। আর একদিন এসে খেয়ে যাবো। আজ আবার অমিয়দাদের শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান দেখতে যাবো বাবার সঙ্গে। অমিয়দা দাঁড়িয়ে আছেন নীচেয়।'

এমন সময় পারুল এলো রসিদ নিয়ে : 'দাও সাড়ে চার টাকা। লীনার অমিয়দা টাকার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।'

পারুলের মা টাকা বার করে দিতে দিতে বললেন : 'দিনে দিনে কত কী দেখবো।'

—'আচ্ছা, আমরা যাই পিসীমা। গেলাম পারুল। এসো বাবা!' বলে লীনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—'কিছু খেলে না, দাদা?' পারুলের মা বললেন।

—'থাক্, মানে আর একদিন হবে। মানে, লীনাকে আবার কোথায়, মানে নিয়ে যেতে হবে বলছে।'

ললিতবাবুর সঙ্গে লীনা আর পারুল নীচেয় নেমে এলো। পারুল সদর দরজা পর্যন্ত এসে অমিয়কে টাকাটা দিয়ে দিলো।

অমিয় ললিতবাবু আর লীনাকে নিয়ে গেলো তার শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান দেখাতে।

শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগ ঘুরে তাদের কাজকর্ম দেখে, তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে, ললিতবাবু আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। বেকার-সমস্যার কী চমৎকার সমাধান! তাঁর মনে পড়ে গেলো ৺মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার কথা : 'মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ ক'সে লাঙ্গল ধর রে তোরা, ক'সে লাঙ্গল ধর্!'

—'বাবা, মানে তোমায় কী ব'লে যে আশীর্বাদ করবো মানে, জানিনে!' গদগদ কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন।

অমিয়র উপর শ্রদ্ধায় লীনা ভ'রে উঠলো। ভাবলো : 'হায়রে, এই সব লোককে লোকে কী করে যে ভুল বোঝে জানিনে। লোকে হীরে ফেলে কাচকে বুঝি এমনি ক'রেই আঁচলে বাঁধে।'

প্রতিষ্ঠানের অফিসে এসে অমিয়কে একলা পেয়ে বললো লীনা: 'অমিয়দা, একটা অনুমতি চাই।'

—'বলো।'

—'আমায় একবার প্রণাম করতে দিন আপনাকে। আপনি প্রণম্য।'

—'আমি নই লীনা।' অমিয় বললো; 'প্রণাম করো ঈশ্বরকে, ধন্যবাদ জানাও তাঁকে। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আর তোমার এ শ্রদ্ধা পাবার অধিকারী তো আমি একলা নই—এ প্রতিষ্ঠানের সকলের সমবেত চেষ্টায় এটা গড়ে উঠেছে।'

—'তা হোক। তবু আপনার উৎসাহ, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা না থাকলে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো না—তা' আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।' লীনা বললো।

—'যদি তাতেই তুমি সুখী হও, গ্রহণ করলাম তোমার শ্রদ্ধা।'

লীনা প্রণাম করলো।

অমিয় বললো: 'তুমি সুখী হও।'

ললিতবাবু এতক্ষণ বাইরে নির্মলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরে অফিস ঘরে এসে বললেন: 'কৈ মা লীনা, মানে চলো এবার বাড়ী যাই।' অমিয়কে বললেন: 'বাবা অমিয়, মানে একদিন আমাদের বাড়ীতে এসো বেড়াতে।'

—'আচ্ছা।' অমিয় বললো।

—এগারো—

অমিয়র কাকীমা একদিন অমিয়কে ডেকে, বললেন : 'আভার ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন এই মাসের শেষে ২৭শে ঠিক হ'য়েছে। উনি বেয়াই মশায়ের সঙ্গে কথা ব'লে এসেছেন। তুই কাল গিয়ে তাদের নিয়ে আসিস ঢাকুরিয়া থেকে।'

অমিয় হেসে বললো : 'এই—এইতো সেদিন ছেলে হোলো। এর মধ্যেই তার ভাত খাওয়ার দরকার হোলো। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে বাঙলা দেশে চাল ডালের আবার একটি অংশীদার জুটলো।'

—'কী যে বলিস্ তুই পাগলের মতো! বলতে আছে নাকি ও সব কথা?' কাকীমা ধমকে দিলেন। অমিয় বেগতিক দেখে সরে পড়লো সেখান থেকে।

পরদিন ঢাকুরিয়া যাবার পথে বালিগঞ্জে নেমে ফার্ণরোডে গেলো লীনাদের বাড়ীতে। যাবার আগে মনকে বোঝাতে হ'য়েছিলো। প্রশ্ন জেগেছিলো মনে : এই তো সেদিন দেখা হয়েছিলো—এরই মধ্যে আবার যাবে সেখানে? ভালো হবে যাওয়া? অবশ্য ললিতবাবু যেতে বলেছিলেন, কিন্তু সেটা নেহাৎ-ই ভদ্রতার খাতিরে। না, না, তিনি আন্তরিক ভাবেই যেতে বলেছিলেন। গেলে কী হ'য়েছে তাতে? লীনার সঙ্গে, তার মা বাবার সঙ্গে, গল্প করলে কী এমন হ'য়েছে?···কিন্তু শুধুই কি গল্প? আর কিছু নয় কি? লীনার সঙ্গ, লীনার——

অমিয় মনকে ধমকে দিলো : না, না! স্রেফ গল্প; আজে বাজে গল্প; খানিকটা সময় কাটানো।···আর, আর মাসীমার সঙ্গে তো অনেকদিন দেখা হয়নি।

অমিয় মনে জোর পেলো।

অমিয়কে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে ললিতবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন প্রায় : 'ওগো, মানে, দেখবে এসো কে এসেছে ?'

'ওগো' ভিতর থেকে বললেন : 'কে এসেছে ?'

—'বাইরে এসে দেখোই না ?' ললিতবাবু স্ত্রীর সঙ্গে একটু রসিকতা করবার জন্যে অমিয়কে ভেতরে যেতে দিলেন না।

একটু পরেই লীনার মা বাইরের ঘরে এলেন : 'ওমা। অমিয় যে ! এসো। এসো বাবা, ভেতরে এসো।'

ললিতবাবু বাধা দিলেন : 'ও কী করছো ? মানে, ও যে মিস্ত্রী ! মানে, লীনার কাছে শোনোনি সে সব কথা ? 'এসো বাবা' এসো বাবা ক'রে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছো মানে ?'

—'সে মানে তুমি বুঝবে না।' লীনার মা বললেন : 'ছেলে যাই করুক মায়ের স্নেহ থেকে সে কখনো বঞ্চিত হয় না। আমার এ ছেলে কলম পিশে পিশে কুঁজো না হ'য়ে বুক ফুলিয়ে যন্ত্র নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করছে ব'লে একে পর কোরে দেবো ?'

—'বাপস্ ! মানে তুমি যে দারুণ বক্তিমে দিলে !' ললিতবাবু হেসে বললেন : 'তোমার মানে এ গুণ আছে—তা তো মানে জানতাম না !'

—'জানবে কী করে ? তুমি যে নিজের 'মানের' ঠেলায় নিজেই অস্থির। অন্যের মানে বা মন বোঝবার সময় কোথায় ?' লীনার মা অমিয়কে বললেন : তা' বাবা তুমি এসেছো ভালোই হ'য়েছে। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'আমার কথা ?' অমিয় অবাক হোলো : 'ব্যাপার কী, মাসীমা ?'

—'ব্যাপার ভীষণ মানে ভয়ঙ্কর !' লীনার বাবা বল্লেন। লীনার মা বল্লেন : 'খুলেই বলো না।'

—'তাই বলুন।' অমিয় বল্লো।

—'মানে তোমায় খাটতে হ'বে

—'হঠাৎ ?'

—'হঠাৎ-ই যে ঠিক হ'য়ে গেলো ; মানে, লীনার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো।'

লীনার মা বললেন : 'যাকে বলে একেবারে হঠাৎ। ছেলের বাবা দেখতে এসে মেয়ে পছন্দ ক'রে গেলেন ; বল্লেন, বরপণ যা ইচ্ছে দেবেন, কিন্তু এই মাসেই বিয়ে দেবেন কিনা বলুন। ছেলেটি ভালো, কাজেই রাজি হোতে হোলো।'

—'বা, বেশ তো!' অমিয় শুক্‌নো হেসে বললো : 'সুখবর তা হোলে ? লুচি পাক্‌ছে বলুন। ছেলে কী করে ?'

—'ছেলে তিনটে পাশ।'

—'তিনটে পাশ মানে ?' লীনার বাবা বাধা দিলেন : 'খুলে বলো।' বুঝেছো অমিয় ? তিনটে পাশ মানে কী জানো ? বি. এ. পাশ।'

—'আচ্ছা, ভুল ধরতে হবে না।' লীনার মা বললেন : 'তোমার মতো তো আমি বিদ্বান নই।'

লীনার বাবা বেগতিক দেখে সরে গেলেন। লীনার মা আরম্ভ করলেন : একটি মাত্র ছেলে। কল্‌কাতায় দু'তিনখানা বাড়ী। ছেলেও কোন্ বড়ো আপিসে চাকরী করে। দেড়শো টাকা মাইনে।'

—'এ তো বেশ ভালো সম্বন্ধ!' অমিয় বললো : 'লীনার কপাল ভালো দেখ্‌ছি। কোথায় গেল সে ?'

—'ওপরে আছে বোধ হয়।' লীনার মা ডাক্‌লেন : 'লীনা ও লীনা!'

—'কী মা ?' লীনা উত্তর দিলো।

—'নীচে আয়, অমিয় এসেছে।'

লীনা নীচে নেমে এলো। তার চলনে সে চঞ্চলতা কৈ? মুখখানি গম্ভীর ; তবু হাসি টেনে এনে বল্‌লো : 'ভালো আছেন, অমিয়দা ?'

—'আছি কিন্তু,—'অমিয় হেসে বললো : 'এ কী কথা শুনি আজি মাসীমার মুখে কহ লীনা ?'

—'কী কথা ?'

—'তুমি নাকি বাপের বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো ?'

—'বাপ মা তাড়িয়ে দিলে আর কী করবো বলুন ?

—'আমার প্রাপ্যটুকু মিটিয়ে যেয়ো কিন্তু।'

—'আপনার আবার প্রাপ্য কী ?'

—'কেন ? মিষ্টান্ন ?'

—'ও ভুলে গেছলুম আপনি ইতর লোক।'

লীনার কথা শুনে সবাই হেসে উঠ্লো।

অমিয়র মৌখিক হাসি মিলিয়ে গেলো যখন সে এলো লীনাদের বাড়ীর বাইরে। তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো : লীনার বিয়ে : লীনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সেখান থেকে আভার শ্বশুরবাড়ীতে গেলো সে। অন্যমনস্ক অমিয়র দেহ বাসে উঠ্লো। বাস থেকে নামলো, হাঁটলো, পৌঁছুলো আভার শ্বশুরবাড়ীতে : কিন্তু মন তার উদাস হ'য়ে গেলো। তার মুখ আভার সঙ্গে কথা বললো : তার হাত গুরুজনদের প্রণাম করলো, কিন্তু তার প্রাণের ভিতরটা অমন করে মোচড় দিয়ে উঠছে কেন ? একটা চাপা আবেগ কণ্ঠনালিকে রুদ্ধ করে দিতে চায়। এ কী চঞ্চলতা !

আভার মেয়েলী চোখ দাদার এ খাপছাড়া ভাব ধরে ফেললো। তাই জিজ্ঞেস করলো : 'দাদা, কৈ, খোকনকে তো আদর করলে না !'

—'তাই তো কৈ খোকন ?' অমিয় চমকে উঠে নিজেকে সংযত করলো।

—'তোমার কী হয়েছে বলো তো ?' আভা জিজ্ঞেস করলো।

—'কৈ, কিছু না।' বলেই একটা কৈফিয়ৎ এলো মাথায় : 'তবে দুদিন থেকে শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাই মেজাজটাও ভালো নেই।'

অমিয়র এই কথা ভাবিয়ে দিলো আভাকে : 'তাই নাকি ? জ্বরটর হয় নাকি ?'

—'কাল রাত্রে একটু হয়েছিলো, এখন নেই। নে তোর গোছানো হোলো ? চল্ যাই।' অমিয় ও প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিলো।

—'হ্যাঁ, চলো যাই। আমার হ'য়ে গেছে।' আভা উত্তর দিলো।

রাত্রে বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অমিয় বিছানার উপর শুয়ে পড়লো। শুয়ে রইলো অনেকক্ষণ চুপ ক'রে। অনেকক্ষণ পরে উঠে বস্‌লো। তার ডায়েরীখানা খুল্‌লো। আজ অনেক কিছুই তার লেখবার ছিলো, কিন্তু শুধু লিখলো :

'লীনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ! কিন্তু আমার মন এত চঞ্চল কেন ? তার ভালো বিয়ে হচ্ছে ; সে সুখী হবে। কিন্তু আমার এতে দুঃখ কেন ! আমারও সুখী হওয়া উচিত। তার সুখে আমার সুখ। আমার শান্তি তার শান্তিতে।'

—বারো—

পরদিন অমিয়র ঘুম ভাঙালো আভা : 'দাদা, ওঠো ! জানো কে এসেছে ?'

—'কে এসেছে ?' অমিয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো।

—'শকুন্তলা এই একটু আগে এলো।'—ব'লে আভা চলে গেলো !

ঠিক বটে ! অমিয়র মনে পড়লো, আজই তো ভোরে শকুন্তলার আস্‌বার কথা ছিলো তার বাবার সঙ্গে। কাকীমার বোনের মেয়ে শকুন্তলা। এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে কল্‌কাতায় এসেছে মাসীর বাড়ীতে বেড়াতে।

অমিয় নীচেয় নেমে গেলো। তাকে দেখে কাকীমা শকুন্তলাকে ডাকলেন। শকুন্তলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছিপছিপে মেয়েটি ; গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হোলেও কালো বলা চলে না। কোঁকড়ানো চুল-গুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে। হাতে সরু দু'গাছি ক'রে চুড়ি। চোখে চশমা।

কাকীমা অমিয়কে দেখে বললেন : 'একে প্রণাম করো, শকুন্তলা। এ হচ্ছে তোমার দাদা।'

শকুন্তলা প্রণাম করতে যাচ্ছিলো, অমিয় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো : 'না, না, প্রণাম করতে হবে না।' অমিয় সরে গেলো : 'আজকাল প্রণাম করা উঠে গেছে। কাকীমা দেখছি একালে জন্মেও সেকেলে হয়ে আছেন।'

শকুন্তলা আর কী করে। একটু হেসে আবার ঘরে ঢুকে গেলো। একটা কথাও বল্‌লো না। ম্যাট্রিক দিলে হবে কী ? মেয়েটি যেমনি কথা বলে কম তেমনি লাজুক।

আভা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো, বললো : 'দাদাটা যেন কী ? প্রণাম করলে আবার কী হয়েছে ?'

কাকীমা বল্‌লেন : 'নতুন নতুন কতই যে শুন্‌বো .

অমিয় বল্‌লো : 'আসল কথা কী জানেন কাকীমা, আমার মনে হয় প্রণাম নিলে মনের অহঙ্কার বেড়ে যায়।'

আভার সঙ্গে শকুন্তলার বেশ ভাব হয়ে গেলো, কিন্তু শকুন্তলার স্বভাবটুকু গেলো না। আভা গল্প করে, শকুন্তলা শুধু শোনে।

আভা যে কথা জিজ্ঞাসা করে শকুন্তলা তার উত্তরটুকু দিয়ে চুপ করে।

আভা অনুযোগ করে : 'তুমি তো, ভাই, নিজের থেকে গল্প করো না ?'

—'পারিনে, ভাই। ছোটবেলার থেকে একলা থেকে এসেছি কিনা ?' শকুন্তলা জবাব দেয়।

একদিন শকুন্তলাকে নিয়ে আর তার ছেলেকে নিয়ে আভা দুপুর-বেলায় তার পুরোনো বন্ধু অনুভাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলো। অনুভার মা দরজা খুলে দিলেন। অনেকদিন পরে আভাকে দেখে খুব খুসী হয়ে উঠলেন :

—'এসো এসো ভেতরে এসো। বাঃ, চমৎকার ছেলে হয়েছে !' বলে'ই ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর কোরে বোললেন : 'তোমার সঙ্গে ওই মেয়েটি কে ?'

আভা বললো : 'ও আমার কাকীমার বোনের মেয়ে শকুন্তলা। এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—'ভালোই করেছো।' অনুভার মা বললেন।

আভা জিজ্ঞেস করলো : 'অনুভা কোথায় ?'

—'সে কলেজে গেছে ; এখুনি আসবে।' অনুভার মা সুরু করলেন তাঁর প্রশ্নবান ছাড়তে : 'শ্বশুরবাড়ী কেমন হলো ? শ্বশুরবাড়ীতে কে,

কে আছেন ? তাঁরা সব কেমন লোক ? তোমাকে ভালোবাসেন তো ? জামাই কী কাজ করে ? কেমন আয় ? শুনলাম, ঢাকুরিয়াতে নতুন বাড়ী করেছো ; আজকাল সেখানেই আছো বুঝি ? ছেলেটি ক'মাসের হোলো ? বেশি কাঁদে না তো ?' ইত্যাদি। আভা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে লাগলো। আরো হয়তো তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে হতো, কিন্তু এমন সময় অনুভা কলেজ থেকে ফিরে আসায় আভা বাঁচলো।

অনুভা আভাকে দেখে বইগুলো একদিকে ফেলে দিয়ে আভার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বললো : 'তুই কবে এলি ? কেমন আছিস্ ? বাচ্চা কবে হোলো ? কর্তা কোথায় ?'

আভা হেসে বললো : 'এতক্ষণ মাসীমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। এখন তোর এতগুলো প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে দেবো কী করে ? বরং আমি জিজ্ঞেস করি, তোর খবর কী ?'

অনুভা হেসে বললো : 'আমার আবার খবর ? খাচ্ছি, শুচ্ছি, পোড়ছি, কলেজ যাচ্ছি। এককথায় চাকায় বাঁধা ঘুরছি।'

অনুভার মা বললেন : 'তোমরা গল্প করো, আমি দেখি কাজ সারি গে।'

আভা এবার হেসে বললো : 'হ্যাঁ রে অনু, তুই কি বুড়ি হয়েই থাকবি ? বিয়ে করবিনে ?'

অনুভা হেসে বললো : 'বর কোথায় ? মালা গেঁথে একজনকে দিতে গেলাম, সে আমার মালা পায়ে দিলো দ'লে। আমি হতাশ হলাম না। আবার সুরু করলাম একমনে মালাগাঁথা। একসময় চোখ তুলে দেখি আমার সে মালার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রার্থী। সানন্দে তুলে দিলাম সে মালা তার হাতে।'

আভা হেসে বললো : 'তা হোলে মরেছিস্ বল ?'

—'তা ভাই মরেছি।'—অনুভা বললো।

—'তোর মনের মানুষটি কে ? কেমন দেখতে ? কী করে ?'

৯

অনুভা হেসে বললো : 'সে সব এখন বলতে মানা! সে এখনও পর। আগে তোর মতো আঁচলে বেঁধে তাকে 'বর' করে নি, ঘর করে নি তার সঙ্গে। তখন একদিন দেখিয়ে নিয়ে আসবো তাকে। এখন ওসব চাপা দে। বরং বল তো শুনি। ঐ মেয়েটি কে? পরিচয়ও তো দিলিনে। তোর ভাবী বৌদি নাকি রে?'

শান্ত মেয়ে শকুন্তলা এতক্ষণ চুপ ক'রে আভার পাশে ব'সে ছিলো। অনুভার কথা শুনে শকুন্তলাব মুখ লাল হ'য়ে গেলো লজ্জায়। মুখে দেখা দিলো বিরক্তির ভাব।

আভা হেসে বললো : 'নতুন মেয়ে মাত্রেই বৌদি হ'তে হবে নাকি?'

আভা কারণ দেখালো : 'শিক্ষিতা, সুদর্শনা, স্বজাতি, তার ওপর কুমারী কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।' শকুন্তলাকে বললো : 'আমার কথায় রাগ করো না ভাই। আমার আবার দোষ হচ্ছে, মনে যা আসে মুখে তা ব'লে ফেলি।'

শকুন্তলা গম্ভীর হয়ে বললো : 'কিন্তু বলার আগে একটু ভেবে বলাই উচিৎ।'—ব'লে উঠে দাঁড়ালো শকুন্তলা। আভাকে বললো : 'চলো আভা বাড়ী যাই, সেখানে কাজ আছে। অগত্যা আভাকে উঠতে হোলো।

—'একটু চা খাবিনে?'—অনুভা জিজ্ঞেস কোরলো।

—'না থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।'—আভা বললো : 'তুই বরং একদিন আমাদের বাড়ী আসিস।'

অনুভা বললো : 'আচ্ছা দেখবো।'

আভারা চ'লে গেলো। অনুভা তাদের থাকবার জন্যে বিশেষ পীড়াপীড়ি করলো না। বরং ওরা চ'লে যেতে, মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। অনুভা বদলে গেছে। সে এখন একলা থাকতে ভালোবাসে। একলা ভাবতে ভালোবাসে। সব সময়েই সে ভাবে। একমনে ভাবে। চুপ করে ভাবে। কী ভাবে সে? কে জানে!

—তেরো—

ক্রমে লীনার বিয়ের দিন এসে পড়্‌লো। যে মানসপ্রতিমাকে অমিয় এতদিন তার হৃদয়-আসনে বসিয়ে সঙ্গোপনে, এমন কি, নিজেরই অজ্ঞাতে, পূজো করে এসেছে আজ তাকে বিসর্জন দিতে হবে। অমিয় ঠিক কর্‌লো লীনার মন থেকে নিজেকে মুছে ফেলতে হবে। এমন কিছুই যেন লীনার কাছে না থাকে যা দেখে অমিয়র কথা লীনার মনে পড়্‌তে পারে। লীনার বিয়েতে অমিয় তাই কোনো উপহারই দিলো না। শুধু দিলো আন্তরিক আশীর্বাদ।

লীনার মায়ের অনুরোধে অমিয় বিয়ের দিন সকাল থেকেই এসে কোমর বেঁধে কাজে লাগলো। ভিয়েনের কাছে বসে ঠাকুরদের কী কী দরকার, কোনো জিনিষ চুরি করছে কিনা, সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখলো। যে জিনিষটা এখনও এসে পড়েনি কিংবা যেটা কম পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম ক'রে আনাবার ব্যবস্থা করলো। খরচে কম হবে অথচ জিনিষটাও ভালো হবে ব'লে অমিয়র ইচ্ছেতেই মিষ্টিটা বাড়ীতেই করবার ব্যবস্থা করলেন ললিত বাবু। অবশ্য তার ভারও পড়লো ঐ অমিয়র উপরেই।

লীনা উপরে ক'নে সেজে বসে ছিলো। ঘরে আরো অনেক মেয়ে জড়ো হয়েছে। হাসি ঠাট্টা গল্প চল্‌ছে অবিশ্রাম ; আর সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বাড়ীময় হুটোপাটি আর মায়ের কোলে শিশুদের একটানা কান্না।

'এই, সরে যাও, সরে যাও,' ব'লতে ব'লতে অমিয় এক সময়ে উপরে এলো ; আর তার পেছনে একটা বড়ো কড়াই দু'দিকে ধ'রে দু'জনে উপরে উঠতে লাগলো। কড়াই ভর্তি লেডিক্যানিং। ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে জায়গা ক'রে অতি সন্তর্পণে কড়াই নামিয়ে রাখিয়ে

লোকদুটোকে বিদায় ক'রে অমিয় ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে সামনে দেখ্‌লো লীনা দাঁড়িয়ে রয়েছে ক'নে সেজে। অলঙ্কারে সাজসজ্জায় তাকে দেবীর মতো দেখাচ্ছে। খোঁপার চারদিকে লালফিতে কুঁচিয়ে দেওয়া, তাতে রূপোর কাজললতা। কপালে চন্দন-চিহ্ন। একটা স্বর্গীয় সৌরভে চারিদিক সুরভিত।

লীনা হেসে বললো: 'যা ভেবেছিলাম, অমিয়দা দেখছি মিষ্টান্ন নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।'

অমিয় বললো হেসে: 'বা রে! ইতর লোকের কাজই তো হচ্ছে ঐ। আমার প্রাপ্যটুকু আমি ছাড়বো কেন?'

—'আর আমার প্রাপ্য?' লীনা প্রশ্ন করলো।

—'কী লজ্জা!' অমিয় কপট গাম্ভীর্য দেখালো: 'লৌকিকতা আবার লোকের কাছে চেয়ে নিতে হয় বুঝি? এ তুমি কেমনতর নির্লজ্জ মেয়ে?'

লীনাও কম যায় না। অমিয়র কথাতে না দমে হেসে বল্‌লো: 'মিস্ত্রী হয়েছেন ব'লে কি লেখাপড়া করতেও ভুলে গেছেন?'

—'কেন, বলো তো?'

—'কেন আবার?' নেমন্তন্নের চিঠির তলায় লেখা আছে দেখেন নি 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়!'

—'দেখেছি বৈ কি! তবে ভেবেছিলাম, ও চিঠি তো মেসোমশায়ের নাম ক'রে ছাপানো। কাজেই ওটা তাঁর ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছে, হয়তো ফাঁকা জিনিষের বদলে সলিড কিছু পাওয়া।'

লীনা তখন আবার হেসে বললো: 'হার মানলাম অমিয়দা!'

অমিয় তখন গম্ভীর হ'য়ে বললো: 'কোনো ঝক্‌ঝকে জিনিষ দিয়ে তোমার মন ভোলাবো তা ভাবতেও পারিনে, লীনা। তুমি যা চেয়েছো তা আমি আগেই দিয়েছি। তুমি সুখী হও!'…বলেই চেঁচিয়ে উঠলো:

'আরে, আরে, তোমার সঙ্গে কথা বলছি···ওদিকে ঠাকুরগুলো কী করছে কে জানে ; দেখি গে যাই।'

অমিয় তর তর করে নীচের নেমে গেল। লীনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে গেলো। তার চোখ দু'টি কি জল-ভরা ?

অমিয় কী ভীষণ খাট্‌লো ! একা অমিয় যেন একশো হয়ে উঠ্‌লো। লোকজন খেতে বসেছে। অমিয় ছুটোছুটি করছে, একবার একতলা, একবার দোতলা, একবার তেতলা। হাতে কখনো লুচির ঝুড়ি, কখনো তরকারীর বাল্‌তি, কখনো চাটনির মালসা, আবার কখনো বা দইয়ের হাঁড়ি। আবার তারই মাঝে এক ফাঁকে সময় ক'রে ছুটে এলো বিয়ের আসরে। সাত পাকের সময়, লীনার পিঁড়ির এক দিকটা অমিয়ই ধরলো। পিঁড়ি উঁচু ক'রে চিৎকারও কর্‌লো : 'বর বড়ো না ক'নে বড়ো ?'

বিয়েতে অমিয়র কাকা কাকীমা, আভা, শকুন্তলা, সবাই এসেছিলো। খাওয়া দাওয়ার পর বিয়ে দেখে তারা বাড়ী চলে গেলো অমিয়র কাকার সঙ্গে।

অনেক রাত্রে খাওয়ার ব্যাপার শেষ হোলো। বিয়ে বাড়ীর হট্টগোল গেলো থেমে। শুধু বাসরঘর থেকে শোনা যেতে লাগলো গানের সুর আর হাসিঠাট্টার শব্দ। অমিয় আর দেরি করলো না। একসময় সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। কোমর থেকে তোয়ালেটা খুলে মুখের কপালের ঘাম মুছে তোয়ালেটা কাঁধের উপর ফেলে চলতে লাগলো।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো হবে। নিস্তব্ধ নগরী। রাস্তার দু'ধারে বাড়ীগুলো প্রহরীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। ক্রমে সে একটা পার্কের ভিতরে এসে একটা বেঞ্চে তার ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলো। অস্ফুট স্বরে শুধু বল্‌লো : 'লীনার বিয়ে হয়ে গেলো !'

'এ বাবু, হিঁয়াপর শুতাল হ্যায় কাহে ?'

অমিয় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। পুলিশের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসে বল্‌লো :

—'তবিয়ত আচ্ছা নহি!'

—'গাড়ী বোলাই দেঙ্গে?'

—'নহি।'

অমিয় বাড়ীর দিকে চল্‌তে লাগ্‌লো। রাত্রির গায় কালো অন্ধকার তখন ফ্যাকাসে হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

—চোদ্দ—

লেকের ধারে গাছগাছড়ায় ঢাকা এক অন্ধকার কোণ থেকে নিশীথ অনুভার হাত ধ'রে বেরুলো।

নিশীথ বাঁ হাতের ঘড়িটা দেখে বললো : 'রাত ৮টা বাজলো। বাড়ীতে কেউ ভাববেন না তো ?'

—'না,' অনুভা হেসে বললো : 'মা'কে বলেছি আজ মানসীর জন্ম-দিন, সেখানে যাচ্ছি।'

—'মানসী কে ?'

—'আমার মানসকন্যা।'

—'তোমার মাকে আজকাল খুব ফাঁকি দিচ্ছো তা হোলে ?' নিশীথ হেসে একটা সিগ্রেট ধরালো। বললো : 'অনু, তোমার চুল এলোমেলো হ'য়ে গেছে, ঠিক ক'রে নাও ! চলো, ঐ নির্জন জলের ধারে বসি গিয়ে।'

অনুভা কাছের গ্যাসের আলোতে ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে আয়না চিরুণী বার ক'রে চুলটা যথাসম্ভব ঠিক ক'রে নিলো। নিশীথের হাতে চিরুণী দিয়ে বললো : 'তোমার চুলটাও ঠিক করে নাও।'

পরে দু'জনে জলের ধারে এসে চুপ করে বসলো। একটু পরে স্তব্ধতা ভাঙলো অনুভা :

—'নিশীথ দা ?'

—'কী ?'

—'রোজই আমায় একটা না একটা মিথ্যে কথা বলতে হয়। কেন ?'

—'আমার কাছে আসবে ব'লে।'

—'কিন্তু সবাইকে বলে আসতে পারি তোমার কাছে যাচ্ছি ! এমন ব্যবস্থা কি হয় না ?'

—'তার মানে ?' নিশীথ প্রশ্নের মানে বুঝতে পেরেও বোকা সাজলো।

অনুভা নিশীথের বাঁ হাতখানা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লো : 'আমায় বিয়ে করো নিশীথদা।'

—'বিয়ে ?' নিশীথ যেন কথাটা এই প্রথম শুনলো : 'তুমি বলছো কী, অনুভা ? বিয়ে মানে তো বন্ধন, শৃঙ্খল, দায়িত্ব। তুমি এই সব চাও ?'

—'হ্যাঁ চাই।' অনুভা জোর গলায় বল্লো।

—'কিন্তু আমি যে চাইনে, অনুভা ?' নিশীথ বললো : 'আমি চাই তুমি যতদিন পারো আমার সঙ্গে প্রেম করো। পরে অসুবিধে হোলে আমায় ছেড়ে দিয়ো, আমি কোনো বাধা দেবো না। শুধু বিদায় নেওয়ার সময় তোমার স্মৃতিচিহ্ন ব'লে দিয়ে যেয়ো তোমার ঐ ব্রোচ কিংবা ভ্যানিটি ব্যাগ। তা-ও তো পেয়ে গেছি আগে থেকেই—তোমার হাতের পরশ-পাওয়া সুগন্ধী রুমাল।

—'না, না ! চুপ করো নিশীথদা,' অনুভা রাগ করলো : 'তোমাকে বিশ্বাস করা আমার ভুল হয়েছিলো। তুমি তো জানো না ?' অনুভা থামলো।

নিশীথ জিজ্ঞাসা করল : 'কী ?'

—'আমি ক'দিন থেকে শরীরের মধ্যে যেন কী রকম বোধ করছি।' অনুভা নিশীথের কোলের মধ্যে ভেঙে পড়লো : 'আমার ভয় হচ্ছে, নিশীথদা, ভীষণ ভয় হচ্ছে। আমায় বাচাও। আমায় বিয়ে করো।'

নিশীথ কিছুই বললো না। কেবল অনুভার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। খানিক বাদে বললো :

—'চলো অনু বাড়ী যাই।'

—'আমার কী হবে, নিশীথদা ?' অনুভা উঠে বসলো।

—'ভয় কী ?' নিশীথ বল্লো : 'যদি সত্যিই কিছু হয় তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। চলো অনেক রাত হ'য়ে গেলো।'

*   *   *

অনুভা তার মার কাছে ধরা পড়ে গেলো। মার মুখ গেলো শুকিয়ে। ঘরের দরজায় খিল দিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—'এ দশা তোর কে করলো ? বল্ শীগগীর মুখপুড়ী !'

অনুভা কাঁদতে লাগ্লো : 'তুমি তাকে চিন্বে না মা।'

—'তাকে ডেকে পাঠা পোড়ারমুখী।' মা বললেন : 'বল্ তাকে বিয়ে করতে।'

—'বিয়ে সে করবে না।' মেয়ে বল্লো।

—'বলেছে ?'

—'হঁ্যা।'

—'কেন করবে না ?'

—'তা জানিনে।'

—'তা জানিনে।' মা ভ্যাঙচালেন : 'দে শীগ্গীর মুখপুড়ী, সে বদমায়েসটার নাম ঠিকানা। দেখি, আমি কী করতে পারি।'

অনুভা কাঁদতে কাঁদতে নিশীথের নাম ঠিকানা লিখে দিলো। পরে বিছানার উপর ভেঙে পড়লো।

অনুভার মা ঠিকানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে গিয়ে দেখেন অমিয় বাড়ীর মধ্যে আস্ছে। ভরাডুবি হবার সময় সামনে একটা খড় ভেসে যেতে দেখলে যেমন মনে আশা হয়, হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়—অমিয়কে দেখে অনুভার মায়ের অবস্থাও সেই রকম হোলো : তিনি যেন অকূলে কূল পেলেন। তাঁর মনে হোলো অমিয় যেন ঈশ্বরপ্রেরিত হ'য়ে এসেছে।... তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে এলেন।

—'এসো, বাবা এসো ! অনেকদিন পরে।'

—'নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে আসতে পারিনি মাসীমা।' অমিয় বললো :

'আজ কাকীমা পাঠালেন আপনার কাছে। আভার ছেলের অন্নপ্রাশন হবে কাল। আপনি আর অনুভা আমাদের বাড়ীতে যাবেন।'

—'আর আমাদের যাওয়া!' অনুভার মায়ের কথায় হতাশার সুর।

অমিয় বিস্মিত হোলো : 'কী হয়েছে মাসীমা?'

—'এসো, বাবা, ঘরে এসো।'—ভদ্রমহিলা অমিয়কে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন : 'তোমাকে খুলে বলা ছাড়া উপায় নেই। আমার আর কে-ই বা আছে যে এর একটা বিহিত ক'রে দেবে? আর তুমি তো আমার ছেলেরই মতো। তোমাকে বলতে বাধা কী? আর এখনই এর ব্যবস্থাও করা দরকার।'

ভদ্রমহিলা এতগুলো কথা বললেন শুধু নিজের মনকে ঠিক করবার জন্যে।

অমিয় আবো বিস্মিত হলো :

—'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, মাসীমা। কী হয়েছে বলুন তো?'

—'আর, বাবা, যা হবার তা ভালোই হয়েছে!'

—'খুলে বলুন, মাসীমা।'

—'অনুভা আমার মুখ পুড়িয়েছে।' অনুভার মা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গেলেন : 'সে বদমায়েসটা নাকি ওকে বিয়েও করতে চায় না। এই যে তার নাম ঠিকানা।' কাগজের টুকরোটা অমিয়র হাতে দিলেন : 'পারবে বাবা, তাকে একবার ধ'রে আনতে এখানে? আমি একবার বুঝিয়ে ব'লে দেখতাম।'

খবরটা শুনে অমিয়র মাথার ভিতরটা যেন চড়াক্ ক'রে উঠ্‌লো। নাম প'ড়ে চিন্‌তে দেরি হোলো না, অনুভার সর্বনাশ কে করেছে। সেই লোকটা! যে লোকটা অনুভাকে মেডেল দিয়েছিলো স্টেজে দাঁড়িয়ে। অনুভার বন্ধু মিঃ এন. সেন।

অমিয় জিজ্ঞেস করলো ; 'আচ্ছা, মাসীমা, আপনি কি জানতেন না অনুভা এই লোকটার সঙ্গে মেলামেশা করছে ?'

—'না বাবা, তা' হোলে তো আগে থাকতেই পোড়ারমুখীকে সাবধান করতে পারতাম।'

—'অনুভা যে রঙমহলে দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে প্লে করতে গেছলো আপনি জানতেন না ?'

—'তা জানতাম। দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে ওর কলেজের মেয়েরা কী জলসা করেছিলো তাতে ও ভিখারিণী না কী সেজেছিলো। মেডেলও পেয়েছিলো বুঝি।'

—'জলসার আগেও বেরুতো না অনুভা ?'

—'তা বেরুতো বৈ কি। রিহার্শেল দিতে যেতো বিকেলের দিকে, আসতো সন্ধ্যার পর।'

—'জলসার পরেও বেরুতো ?'

—'তাও তো মাঝে মাঝে বেরিয়েছে তার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে ; কখনো বা পড়া বুঝিয়ে নেবার জন্যে।' ভদ্রমহিলা উৎসুক হ'লেন : 'কেন ,বাবা, এতকথা জিজ্ঞেস করছো ? কিছু জানো নাকি ?'

—'জানিনে বিশেষ কিছুই ! তবে এই লোকটাকে আমি চিনি।' অমিয় উঠ্‌লো : 'আচ্ছা, আমি যাই, দেখি, তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি কিনা।'

অমিয় বেরিয়ে যাচ্ছিলো ; অনুভার মা পেছন থেকে বললেন : 'দেখো বাবা, যা করবার গোপনেই কোরো। এ কেলেঙ্কারির কথা যেন প্রকাশ না পায়।'

—'আচ্ছা।' ব'লে অমিয় বেরিয়ে গেলো।

তার মনের মধ্যে কে যেন কী বলতে চাইছে। কী ?

—পনেরো—

আভার ছেলের অন্নপ্রাশনে বেশি লোককে বলা হয়নি তার শ্বশুরের ইচ্ছামতো। তবে অনুভারা আসেনি কেন অন্নপ্রাশনে, কারণ কেউ জান্‌লো না।

কাকীমা একবার জিজ্ঞেস করতে অমিয় বলেছিলো : 'মাসীমার জ্বর, কাজেই অনুভারা কেউই আসতে পারবে না।'

আভা আবার শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবে দু'একদিনের মধ্যে। কাজেই ঠিক করলো, নারী-শিক্ষা-সমিতিতে একজিবিসন হচ্ছে সেলাইয়ের, দেখে আসবে সবাই গিয়ে।

শকুন্তলার শরীরটা সেদিন ভালো ছিলো না। তাই সে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলো। এমন সময় তার মাসীমা অর্থাৎ অমিয়র কাকীমা এসে বললেন : 'চলো, কুন্তলা, নারী-শিক্ষা-সমিতিতে একজিবিসন দেখে আসি।'

আভাও বললো : 'চলো না, ভাই!'

শকুন্তলা বললো : 'আজ আমার শরীরটা মোটে ভালো লাগ্‌ছে না। রাগ ক'রো না ভাই, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

অমিয়র কাকা বাড়ী থাক্‌লে কাকীমার কোথাও বেরুনো হয় না। কাকা কাল বিশেষ কাজে মফঃস্বলে গেছেন; কাজেই কাকীমা সুযোগটুকু ছাড়লেন না। শকুন্তলাকে সাবধানে থাক্‌তে ব'লে তিনি আভাকে, আভার ছেলেকে, নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাছেই নারী-শিক্ষা-সমিতিতে। যাবার সময় শকুন্তলাকে সাবধানে থাকতে ব'লে গেলেন।

আভারা চলে গেলে শকুন্তলা তার মাসীমার ঘরে এসে ঢুক্‌লো।

টেবিলের উপর একখানা উপন্যাস প'ড়ে ছিলো। শকুন্তলা বইখানা হাতে নিয়ে খাটের পেছনের দিকে জানলার ধারে বস্‌লো এসে।

শরীরটা ভালো নেই, তাই বইয়ের পাতা খুলেও পড়তে ভালো লাগ্‌লো না তার। মাথাটা ধ'রে রয়েছে; কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লো একটু গরম যেন! জান্‌লার ধারে বস্‌তেই দখিন হাওয়া এসে শকুন্তলার গায়ে কপালে যেন হাত বুলিয়ে দিলো। মাথা ধরা অনেক ক'মে গেলো। ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো, কিন্তু শকুন্তলা ঘরের আলো জ্বালালো না ভয়ে। পাছে, আলোতে আবার তার মাথা ধরে।

তারপর ঠাণ্ডা হাওয়াতে এক সময় নিজেরই অজ্ঞাতে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। খোলা বইখানা তার অবশ হাত থেকে প'ড়ে গেলো মাটিতে।

*   *   *

অমিয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটা বাড়ী মেরামতের কাজ দেখা-শুনা ক'রে সোজা বাড়ী চলে এলো। কোনো কাজে ভালো ক'রে সে মন লাগাতে পারছে না। কেবলই তার মনে হচ্ছে অনুভার এ অধঃপতন হোলো কেন? কেন? কার জন্যে?

অমিয় বাড়ীতে ঢোকবার সময় দেখ্‌লো বাড়ীর উড়ে চাকরটা সামনের রকে ব'সে বন্ধুদের নিয়ে তাশ পিট্‌ছে। দাদাবাবুকে অসময়ে আস্‌তে দেখে নিজে থেকেই বল্‌লো: 'মায়েরা একোজিবিসনো দেখতে গছে।'

—'ভালোই হয়েছে।' অমিয় নিজের মনে মনেই বল্‌লো: 'একটু নির্জনে, নিশ্চিন্তে ভাবতে পারবো।'

সে ভাবতে চায়। একমনে ভাবতে চায়। ভালো ক'রে ভেবে দেখতে চায়: কেন, কেন অনুভার এমন হোলো? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলো কেন? ভুল ক'রে, না, ইচ্ছে ক'রে? সদর দরজা খোলাই ছিলো। অমিয় সোজা উপরে গেলো। দেখলো তার ঘরটায়

তালা দেওয়া। তবে কাকীমার ঘরের দরজা খোলা। কাজেই অমিয় কাকীমার ঘর খোলা দেখে সেই ঘরেই ঢুকে জামা কাপড় শুদ্ধ সটান খাটের উপর শুয়ে পড়লো।

শকুন্তলা তখন ঐ খাটের ঠিক পেছনেই জান্‌লার ধারে ঘুমে অচেতন।

অমিয়ও ঘরের আলো জ্বালানো দরকার বোধ করলো না। অন্ধকার সেও চায়। অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তার ভাব্‌বার দরকার হ'য়ে পড়েছে। কেন অনুভার এ অধঃপতন? অনুভার দুর্দশার জন্যে দায়ী কে? অনুভা? নিশীথ? না সে নিজে?

অমিয় চোখ বন্ধ করলো। ভালো ক'রে ভাবতে লাগ্‌লো: সে নিজে দায়ী কি না?

—'হ্যাঁ অমিয়, তুমি দায়ী।' মন বল্‌লো।

অমিয় বল্‌লো: 'কেন?'

—'অনুভার প্রেম তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে।'

—'তাই তার ঐ দশা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু তুমি কি জানো না লীনাকেই আমি—'

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়্‌লো আভা আর তার কাকীমার হাঁক ডাকে:

—'শকুন্তলা।'

—'কুন্তলা!'

ডাক শুনে শকুন্তলার ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই দেখে খাটের উপরে অমিয়দা। শকুন্তলাকে ঐ ঘরেই দেখ্‌তে পেয়ে অমিয় অবাক হ'য়ে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: 'তুমি এখানে?'

—'হঁ্যা' বলেই শকুন্তলা তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে

যাচ্ছিলো, এমন সময় দেখ্লো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে নিয়ে আভা আর তার পেছনে কাকীমা।

ক্ষণেকের জন্যে কারোর মুখে কথা নেই। অমিয় তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বালালো।

—'এ সব কী?' কাকীমা গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্ন করলেন।

—'কিছুই না।' অমিয় বল্লো।

কাকীমা বললেন: 'তার মানে?'

—'আপনি যা ভাব্ছেন তা নয়।'

—'তোমার কথাই কি বিশ্বাস কর্তে হবে?'

—'অবিশ্বাসের তো কিছু নেই।'

—'অন্ধকার ঘরে তোমাকে আর কুন্তলাকে একসঙ্গে দেখ্বার পরেও কি তুমি আমাকে তোমার কথা বিশ্বাস করতে বলো?'

—'হ্যাঁ, বলি।' অমিয় বললো।

কাকীমা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন:

'তুমিও কি তাই বলো?'

—'আমি খাটের পেছনের জান্লার ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম,' শকুন্তলা বল্লো: 'কখন যে অমিয়দা ঘরে এসেছেন আমি জানতেও পারিনি। পরে তোমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেছে।'

—'আমিও জান্তুম না শকুন্তলা এই ঘরেই আছে।' অমিয় বল্লো: 'আমি ভেবেছিলুম সেও তোমাদের সঙ্গে গেছে।'

—'মিথ্যে কথা।' কাকীমা বল্লেন।

—'কিন্তু আমরা জানি আমাদের কথা খুবই সত্যি।' অমিয় আর সেখানে দাঁড়ালো না।

—'এখন বুঝছি': কাকীমা শকুন্তলাকে একলা পেয়ে বল্লেন: 'কেন তোমার শরীর খারাপ হয়েছিলো। ছিঃ, ছিঃ, কুন্তলা! লেখাপড়া

শিখেছো, কিন্তু এ কী জঘন্য প্রবৃত্তি! জামাইবাবুকে কালই আস্‌তে লিখে দেবো। তিনি এসে যেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে যান। ছিঃ, ছিঃ, কেলেঙ্কারি!'

আভা এতক্ষণ কিছুই বলেনি। এবার বললো: 'শকুন্তলাকে আমি ভালো মেয়ে ব'লেই জানতুম।'

শকুন্তলা আর চুপ ক'রে থাকৃতে পারলো না। দরজার পাশে ব'সে প'ড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

—ষোলো—

পরদিন ছিলো রবিবার। শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখাশোনা ক'রে বেলা ৪৷৷০।৫টার সময় অমিয় নিশীথদের মেসে গেলো। মেসের অনেকেই তখন বেরিয়ে গেছেন। কয়েকজন যাঁরা আছেন তাঁরাও বেরুবার উদ্যোগ করছেন। নিশীথের ঘরে গিয়ে অমিয় দেখ্‌লো, সেও বেরুবার জন্যে জামাকাপড় পরছে।

অমিয়কে দেখেই নিশীথ চিন্‌তে পার্‌লো। হেসে বল্‌লো: 'এই যে মিস্‌ রায়ের অমিয়দা, নমস্কার!'

—'নমস্কার!' অমিয় প্রতিনমস্কার কর্‌লো।

—'বসুন। তারপর?' নিশীথ জিজ্ঞাসা কর্‌লো: 'হঠাৎ এ গরীবের গরীবখানায় কী মনে ক'রে বলুন তো?'

—'তাও ব'লে দিতে হবে?' অমিয় বল্‌লো।

—'নইলে জান্‌বো কী ক'রে?'

—'অনুভাকে তো জানেন?'

—'জানি বৈকি!'

'আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে তাদের বাড়ীতে।' অমিয় বল্‌লো।

—'তাদের বাড়ীতে? কেন বলুন তো?' নিশীথ অবাক হ'য়ে গেলো।

অমিয় বল্‌লো: 'অনুভার মায়ের বিশেষ অনুরোধ। আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেই হবে। নিন, জুতোজোড়া পরে নিন।'

—'কিন্তু অনুভার মায়ের হঠাৎ এ অনুরোধ? ব্যাপার কী?' নিশীথ বললো।

—'ব্যাপার তো আপনিই জানেন ভালো।'

—'কিন্তু এখন না শুন্‌লে তো যেতে পারছি না'—নিশীথ জামা খুল্‌তে লাগ্‌লো।

—'অনুভাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে তিনি আপনাকে অনুরোধ কর্‌বেন।'

—'মাপ করবেন!' নিশীথ বল্‌লো: 'ঐ বিয়েটিয়ের ব্যাপারে আমি নেই।'

কথা শুনে অমিয়র শরীর রাগে জ্বলে উঠ্‌লো। বল্‌লো: 'মেয়েটির সর্বনাশ কর্‌বার সময় তো আপনি বেশ ছিলেন!' অমিয় আবার নরম হ'লো: 'চলুন, মশায়, আপনাকে জোড়হাত কর্‌ছি—একটা মেয়ের জীবন এ ভাবে নষ্ট ক'রে দেবেন না।'

—'নষ্ট, সর্বনাশ! এসব আপনি কী বল্‌ছেন?' নিশীথ বল্‌লো: 'আমি কি তাকে জোর ক'রে ধরে এনেছিলুম? সেই তো নিজে এসে ধরা দিয়েছে।'

—'আচ্ছা বেশ, আপনি এখন চলুন।' অমিয় বল্‌লো।

—'না মশায়, আমার এখন কাজ আছে। আপনি এখন যেতে পারেন।'

—'আপনি যাবেন না তা হোলে?'

—'বল্‌ছি তো, না।'

—'তা হোলে যাবেন না?'

—'না, না, না!'

সঙ্গে সঙ্গে অমিয়র বজ্রমুষ্টি নিশীথের মুখের উপর সশব্দে এসে পড়লো। নিশীথ উল্টে বিছানায় পড়ে গেলো। পরে উঠে অমিয়কে আক্রমণ করতে গেলো, কিন্তু তার আগেই অমিয়র আর এক ঘুঁসি নিশীথের নাকে এসে লাগায় তার মাথা ঘুরে উঠ্‌লো। নিশীথ অজ্ঞান হ'য়ে বিছানার উপর প'ড়ে গেলো।

অমিয় তাড়াতাড়ি মেস থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সামনেই একটা চলন্ত বাস দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো তাতে। কোথা দিয়ে কী হ'য়ে গেলো অমিয় নিজেই বুঝ্‌তে পারেনি। তার মনের অবস্থা মোটেই ভালো নেই, তাই হঠাৎ তার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছিলো। তাই তো ঐ রকম কাণ্ডটা ঘটে গেলো। অমিয় ভাব্‌লো মারাটা উচিৎ হয়নি।

'না, না, ঠিক হয়েছে!' অমিয় নিজেকে শুধ্‌রে নিলো: 'ও রকম লোকের পক্ষে মার খাওয়াই উচিত। আরো কিছু উত্তম-মধ্যম দিলে হ'তো।'

বাড়ীর কাছে এসে অমিয় দেখ্‌লো অসংখ্য লোক তাদের বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার কী? অমিয় অবাক হয়ে গেলো।

বাড়ীর দরজার কাছে আসতেই পাশের বাড়ীর রামবাবু ব'লে উঠ্‌লেন: 'এই যে, অমিয়বাবু এসেছেন!'

'কী ব্যাপার, মশায়?' অমিয়র মুখ শুকিয়ে গেছে।

—'আপনাদের বাড়ীতে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

—'আত্মহত্যা!'

অমিয় পাগলের মতো বাড়ীর ভিতরে ছুটে গেলো। বাড়ীর ভিতরেও লোক এসে পড়েছে। তাদের ঠেলে অমিয় উপরে গেলো। দেখ্‌লো দরজার পাশে চাকরটা চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় দাড়িয়ে আভা আর কাকীমা ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছেন। কাকীমার ঘরের মধ্যে আট-দশজন পাড়ারই ভদ্রলোক রয়েছেন। তাদের সরিয়ে দিয়ে অমিয় ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লো শকুন্তলার প্রাণহীন দেহ মেঝেয় প'ড়ে আছে। তারই কাপড়ের আঁচল গলায় ক'সে বাঁধা। ক'স বেয়ে পড়েছে

তাজা রক্ত। কোঁকড়ানো চুলের রাশি মেঝেয় ছড়িয়ে রয়েছে। চোখের চশমাটা দূরে মেঝেয় পড়ে আছে।

অমিয়র মাথাটা ক্ষণেকের জন্যে ঘুরে উঠ্লো। চোখ বন্ধ ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লো :

—'কখন এমন হোলো ?'

—'প্রায় আধঘণ্টা আগে।' একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন : 'আপনাদের বাড়ীর মেয়েদের কান্না শুনে আমরা জান্‌তে পারলাম।'

আর একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অমিয়র হাতে এক টুক্‌রো কাগজ দিলেন। অমিয় পড়্লো :

'আমার এ আত্মহত্যার জন্যে আমিই দায়ী। শকুন্তলা।'

—'পুলিশে কেউ খবর দিয়েছেন ?' অমিয় জিজ্ঞেস কর্‌লো।

একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন :

—'ধীরেনবাবু গেছেন পুলিশে খবর দিতে।'

পুলিশ এলো। জেরা, অনুসন্ধান, থানায় ছুটোছুটি, পোস্ট-মর্টেম, অনুষ্ঠানের কিছুই বাদ গেলো না। অমিয়র কাকাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছিলেন। শকুন্তলার বাবাও এসেছিলেন পরে। দুর্ঘটনার আবর্তনে প'ড়ে সবাই ঘুর্‌পাক খেলেন ; কিন্তু যে গেলো, সে আর ফিরে এলো না।

কয়েকদিন পরে পুলিশের হাঙ্গামা মিটে গেলো। শকুন্তলার বাবা তাঁর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে দেশে চলে গেলেন। কিন্তু অমিয়দের বাড়ীর সবাইয়ের মনের কোণে একমাত্র প্রশ্ন উঁকি মার্‌তে লাগ্লো : 'শকুন্তলা আত্মহত্যা কর্‌লো কেন ? সেদিনকার সেই ব্যাপারের জন্যেই কি ?'

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলো—যেদিন পাওয়া গেলো শকুন্তলার শেষ চিঠি তার মাসীমারই বিছানার তলায়।

লিখেছে :

মাসীমা ! মরণকে বরণ করবার আগে আর একবার তোমাদের জানিয়ে যাই আমি নির্দোষী। অমিয়দাও। কলঙ্কের কোনো কালিমাই আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবু অবস্থার বিপাকে প'ড়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় ক'রে নিতে হোলো। আমার নামের সঙ্গে অমিয়দার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর জীবন হোলো দুঃসহ, আর আমার জন্যে একমাত্র উপায় রইলো আত্মহত্যা। তাই আত্মহত্যাই করলুম।

ইতি—তোমার কাল্পনিক কলঙ্কিনী কুন্তলা।

—সতেরো—

অমিয়র মন যেমন এলোমেলো হ'য়ে গেছে, তেমনি এলোমেলো হয়েছে তার বাইরের বেশভূষা। খায় না ভালো ক'রে ; রাতের পর রাত অনিদ্রায় কেটে যাচ্ছে। মনটাকে কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে সারাদিনটা শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানেই কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিভাগের কাজ দেখাশোনা করছে। বাইরের কাজে যে ছেলে যাচ্ছে অমিয়ও তার সঙ্গে যাচ্ছে। তার সঙ্গে খাটছে অথচ তার প্রাপ্য মজুরীর সব ক'টি টাকাই ছেলেটিকে দিয়ে দিচ্ছে।

একে কাজের অন্ত নেই, তবু আরো কাজ চায় অমিয়। নির্মলকে বললো : 'আমাদের সব বিভাগই প্রায় খোলা হয়েছে। এবার আমার ইচ্ছে—প্রতিষ্ঠানের 'গাড়ী-বিভাগ' খোলা হোক।'

'আপত্তি নেই।' নির্মল বললো : 'প্রতিষ্ঠানে ছেলেও আছে, আর গাড়ী কেনবার মতো টাকারও অভাব হবে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি—এত খাটলে তোর শরীর ভেঙে পড়বে যে!'

অমিয় ম্লান হাস্‌লো : 'ভয় নেই রে নির্মল, এ আমার ননীর শরীর নয় যে একটুতেই ভেঙে পড়বে।'

নির্মল বুঝলো না, অমিয়র মন ভেঙে পড়েছে, শরীর নয়। শুধু মন ভেঙে পড়েনি, নিজেকে অপরাধী মনে ক'রে নিয়ত সঙ্কুচিত হ'য়ে রয়েছে সে। নিজেকে নিজে সে একটা দুষ্টগ্রহ ব'লে ঠিক করেছে। যার জীবনে সে এসেছে তার জীবনই হয়েছে দুঃসহ, তার জীবনই ছারখার ক'রে দিয়েছে—কেবল লীনা ছাড়া।

হ্যাঁ, খুব বেঁচে গেছে লীনা! খুব বেঁচে গেছে সে। অমিয় ভেবে একটু সান্ত্বনা পেলো। লীনা আজ সুখী ; লীনা আজ পরম শান্তিতে সংসার করছে। ঐ টুকুই যা সান্ত্বনা। কিন্তু অনুভা? সদা হাস্যময়ী

চঞ্চলা অনুভা? তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে আকুল-হয়ে-থাকা অনুভা? তার কাছে আঘাত পেয়ে কোন্ অতলে তলিয়ে গেলো।

তাকে সে হাত ধরে সস্নেহে সমাজের সম্মানের আসনে বসাতে পারতো! তা না ক'রে তাকে অপমান ক'রে, তার প্রেমকে উপহাস ক'রে ঠেলে ফেলে দিলো সমাজের ঘৃণ্য দুর্গন্ধময় পাঁকে।

আর শকুন্তলা? আহা শকুন্তলা! বেচারী! কী কুক্ষণেই এসেছিলো! সল্পভাষিণী অভিমানিনী সে—মিথ্যা কলঙ্কের ডালা মাথায় নিয়ে নীরবে তার জীবন বিসর্জন দিলো। কাউকে তার অভিযোগ জানালো না, কাউকে দোষারোপ করলো না, শুধু পৃথিবীর এই ভুল বোঝা লোকদের উপর অভিমান করেই বুঝি চলে গেলো এই পৃথিবী ছেড়ে। কিছুই হবার নয়, অথচ অমিয়র সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে জটিল হ'য়ে ঘটনাচক্রে কত বড়ো দুর্ঘটনাই না ঘটে গেলো!

সব, সব অমিয়র জন্যে। অমিয়ই দায়ী এ সবের জন্যে। অমিয় নিজেকে সব বিষয়েই দোষী মনে করতে লাগলো।

অমিয় অনুভার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। অমিয়কে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখেই অনুভা লজ্জায়, সঙ্কোচে চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। অনুভার মা নীচেয় ছিলেন। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'সে এসেছে?'

—'না।' অমিয় বললো।

—'আসবে না?'

—'না।'

—'জানতাম সে আসবে না।'

অনুভার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আর কোনো কথা বেরুলো না

তাঁর মুখ থেকে। অমিয়ও চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে অনুভার মা-ই আবার কথা বললেন :

—'এখন কী করা যায়, বাবা অমিয় ? এ কলঙ্ক তো চাপা দেবার নয় !'

অমিয় যেন কী ভেবে নিয়ে বললো :

'আচ্ছা, মাসীমা !'

—'কী ? বলো !'

—'একটা কথা আপনাকে বলতে চাই ।'

—'বেশ তো, বলো। আমার কাছে তুমি এত সঙ্কোচ করছো কেন, অমিয় ?'

অমিয় অপরাধীর মতো বললো : আচ্ছা মাসীমা, আমি যদি অনুভাকে বিয়ে করি, তা হোলে কি এ কলঙ্ক চাপা পড়ে না ?'

—'এ তুমি কী বলছো, অমিয় ?' অনুভার মা আঁৎকে উঠ্লেন : 'তুমি অনুভাকে বিয়ে করবে ? তুমি কি ঠাট্টা করছো অমিয় ?'

—'এ কি ঠাট্টার সময়, মাসীমা ? আমি সত্যিই বলছি।' অমিয় বললো।

—'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছিনে, বাবা অমিয় ! একটা কুলত্যাগী মেয়েকে বিয়ে ক'রে তোমারই বা ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে কেন, বাবা ?'

—'সে আমি বুঝবো ।'

—'কিন্তু তোমার কাকা কাকী বোন রাজি হবেন কেন ?'

—'তাঁরা এসব কিছুই জানেন না।'

—'কিন্তু একদিন তো জানতে পারবেন।'

—'তাঁরা জানবেন আমি অসংযমী ; তাঁরা জানবেন অনুভার সন্তান আমারই সন্তান ! আর তা জানলে ক্ষতি কী, যদি সমাজ ওদের গায়ে হাত না দিতে পারে ?'

অনুভার মায়ের চোখদুটো ছলছল করতে লাগলো। দ্বিধা-মাখানো গলায় বললেন : 'কিন্তু আমার মন যে এতে সায় দিচ্ছে না, বাবা!'

—'আপনি ভয় পাচ্ছেন, মাসীমা?'—অমিয় অনুভার মায়ের কাছে এসে বোঝাতে বসলো : 'আচ্ছা, মাসীমা, মনে করুন না, অনুভা তার ঐ অবস্থায় বিধবা হয়েছে, আর আমি যেন সেই বিধবাকে বিয়ে করছি। জানেন তো, বিধবা বিয়ে আমাদের সমাজে অনেক হয়েছে।'

'—তা তো জানি; কিন্তু সে সব বিধবাদের তো একদিন শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য করে বিয়ে হয়েছিলো। আর এ পোড়ারমুখীর যে তাও হয়নি, বাবা!'

—'হয়েছিলো, হয়েছিলো। ওদেরও হয়েছিলো। শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে বা লোকজন খাইয়ে হয়নি বটে, তবে মনে মনে হয়েছিলো। ওদের মনের মিল ছিলো। আর সেই তো আসল বিয়ে।'

অনুভার মা বললেন, 'কী জানি, বাবা, আমি তো বুঝতে পারছিনে।'

অমিয় বললো : 'এই সোজা কথাটা বুঝুন না! অনুভা ছেলেমানুষ। বাইরে বেরিয়ে কী করে নিজেকে সামলে চলতে হয় বেচারী জানতো না। জানতো না, মেয়েদের চলার পথের দু'ধারে আছে মেয়ে-ধরা ফাঁদ পাতা। ভুল ক'রে সে ফাঁদে পা দিয়েছে ব'লে তাকে ফাঁদে জড়িয়ে মরতে দেখবো? আসল কথা কী জানেন, মাসীমা, আপনাকে বলতে লজ্জা নেই—আজকালকার মেয়েরা ঐ সব সিনেমার সস্তা প্রেম দেখে দেখে সব সময় যেন প্রেমালু হ'য়ে থাকে। তাদের ধারণা হয়, প্রেম মানে বুঝি চাঁদনীরাতে গান গাইতে গাইতে এ গাছের ডাল ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে ও গাছের ডাল ধরা আর তার গানের কথা আর সুর মিলিয়ে প্রেমিকবরের গান করা। সত্যি মাসীমা, বড়ো দুঃখু হয়—যখন দেখি সে মেয়ের সে সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। তার প্রেমিক তার কাছ থেকে যা নেবার নিয়ে সরে পড়েছে তাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো ফেলে দিয়ে।'

অনুভার মা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশার সুরে বললেন : 'সবই তো বুঝছি, বাবা ! শুধু কী করা যায় তাই যে বুঝতে পারছিনে।'

অনুভা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব শুনছিলো। আর পারলো না আড়ালে থেকে নিজেকে সংযত রাখতে। একটা চাপা কান্না গুমরে উঠ্‌তে লাগলো মনের ভিতর থেকে। নিজের অপরাধ স্বীকার করবার একটু সুযোগ পেলে সে যেন বেঁচে যায়। একটু সহানুভূতি পেলে সে যেন গলে যাবে ! ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে :

—'অমিয় দা, আমায় ক্ষমা করো !' অমিয়র পায়ের উপর কেঁদে পড়লো অনুভা।

—'উঠে বসো, অনুভা।' অমিয় অনুভার হাত ধরে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু উঠ্‌লো না সে। সেই ভাবে পায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

—'ওঠো ! কেঁদো না।' অমিয় বললো।

—'আমায় কাঁদতে দাও। আমায় প্রাণ ভরে কাঁদতে দাও তোমার পায়ের উপর। আমায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, অমিয় দা !' অমিয়র পা দু'খানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলো। চোখের জলে ভিজে গেলো অমিয়র পা। অমিয়র পা অনুভার এলোচুলে ঢাকা পড়ে গেলো। অমিয় কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করেই রইলো।

অনুভার মা বললেন : 'ওকে কাঁদতে দাও, অমিয় ! ও বুঝুক—ও কী করেছে। তোমাকে চিন্‌তে সুযোগ দাও ওকে, অমিয় !'

পা থেকে মুখ তুলে অনুভা বললো : 'ওগো, আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। ভালো ক'রেই পেরেছি। তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েই আজ আমার এই কলঙ্ক। নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি।'

অমিয় এবার অনুভার দু'হাত তুলে ধরে বললো : 'ভুল শুধু তুমিই করোনি, অনুভা। আমিও করেছি; হয়তো আমারি দোষে তোমার এই

দুর্দশা। আর যাতে অধঃপতনের পেছল পথে গড়িয়ে না যাও তাই আমি তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছি তোমাকে টেনে তোলবার জন্যে। ভয় পেয়ো না, অনুভা। সমাজ মানুষ তৈরি করেনি। মানুষ সমাজ তৈরি করেছে। মানুষের তৈরি সমাজ থেকে একটি মানুষ একটু ভুলের জন্যে পতিত হয়ে যাবে? তা হতে দেবো না। ··আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

—'অমিয় দা, তুমি এত মহৎ!'

—'মহৎ? আমি মহৎ—কে বললে তোমায়?' অমিয় হাসলো: 'আমার মতো নিষ্ঠুর, নির্দয় আর আছে কিনা জানিনে।'

—'তাই বুঝি তুমি আমার মতো হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে চাইছো?' অনুভা বললো: 'অমিয় দা, তোমাকে আমি এতদিন ভুল বুঝেই এসেছি, আর আমায় ভুল বুঝিয়ো না। আমি কি বুঝিনে তুমি যদি ঘৃণা ক'রে আমার হাত না ধরতে, আমাকে ডুবে যেতে হতো সমাজের পঙ্কিল আবর্তে?'

অমিয় আবার হাসলো: "কী না হোলে কী হয়ে যেতো, আর কী হোলে কী হ'তে পারতো না—অতশত বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই, অনুভা! আমি বুঝি—মানুষমাত্রেই ভুল করে; আর সে ভুলের ক্ষমাও আছে।'

—'তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে সমাজের কাছে দোষী হয়ে রইলে!'

—দোষী? কে দোষী?' অমিয় বজ্রস্বরে বললো: 'দোষী আমাদের ভীরু সমাজ। ফুল তুলতে ভুল করে যদি আঙুলে তোমার কাঁটা ফুটেই গিয়ে থাকে, সে কাঁটা তুলে দেবার অধিকার আমার থাকবে না বলতে চাও? শুধু অসহায় হয়ে দেখতে হবে? অমন মানা আমি মানিনে! অন্যায় করবো না, অন্যায় সইবো না বিবেক যা বলবে তা না মেনে, লোকভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকবো কেন? জানি, সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান। আমাদের সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনের ধারা বদলাতে হবে; দরকার হোলে

ভাঙতে হবে ; ঠিক প্রমত্তা পদ্মানদীর মতো। একদিক ভেঙে আর একদিক নতুন ক'রে গড়তে হবে। নতুন দিনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। সেই সহজ, সরল, সুন্দর দিনের আর বেশি দেরি নেই। আসছে, সেদিন আসছে যে দিন মহামানবধর্মে মনুর ধর্ম বিলীন হবে। দিন আগত ঐ !'

—শেষের কথা—

এ কাহিনী শুনে আমার বন্ধুরা আঁৎকে উঠলো। সমীর জিজ্ঞেস করলো :

—'তুমি ঐ কলঙ্কিনী অনুভার সঙ্গে অমিয়র সত্যিই বিয়ে দেবে নাকি?'

প্রমোদ কাব্য করে বললো : 'পবিত্র পদ্মকে পঙ্কে দেবে ফেলে? এ অন্যায়।'

মনোজ প্রস্তাব করলো : 'ওকে মেরে ফেলো।'

শুনে বিজন সমর্থন করলো : 'ওকে দড়ি কলসী জোগাড় ক'রে দাও। ও ডুবে মরুক। ওর বাড়ী বাদুড়বাগানের কাছেই তো আছে খাল। ঐ খালে সেদিনও একটি মেয়ে ডুবে মরলো, জানি।'

সমীরের মনে হয়তো দয়া হোলো। বললো :

—'তার চাইতে বরং ওকে বাড়ী থেকে দূর করে দাও। যেখানে ইচ্ছে মরুক গিয়ে। সমাজ তো বাঁচলো।'

প্রমোদ বললো তখন : 'তাতে একটু ভাববার আছে। হয়তো অন্য ধর্মের কেউ ওকে বিয়ে ক'রে তার সমাজে স্থান দিতে পারে। আর, আমাদের সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফাঁকি দিয়ে অন্য সমাজে গিয়ে যদি সে সুখে ঘর-সংসারই করলো তবে তার পাপের শাস্তি হোলো কোথায়? প্রায়শ্চিত্ত হোলো কৈ?

মনোজ তখন প্রস্তাব করলো : 'তবে ওকে ঠেলে দাও পাপের পথে। পিছল পথে দিব্যি গড়িয়ে গিয়ে ঠেকবে গিয়ে রামবাগান বা সোনাগাছির কোনো দরজায়। মানে, আমাদেরই সমাজের নর্দমার ধারে ব'সে কামুকদের কামনাগ্নি নেভাবার ভার নিক্ সে। আমাদের সমাজের ভালো মেয়েরা বাঁচুক ঐসব কামুকদের হাত থেকে।

বিজন সায় দিলো : 'এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।'

আমি সব শুনে শেষে বললাম : 'দেখি একটু ভেবে—কী করা যায়। বন্ধুরা পরে গল্পগুজব ক'রে চ'লে গেলো।

* * *

রাত্রি। ঘরের ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজলো। নীচে সংসারের কাজ— তখনও সারা হয়নি। বাসন-পত্রের ঠুং-ঠাং শব্দ ক... আসছে।

আমি উপরে আমার বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে খাতাকলম নিয়ে লেখবার চেষ্টা করছি। সন্ধ্যেবেলায় বন্ধুর দল এসে যে সব কথা ব'লে গেলো—এক এক ক'রে মনে পড়তে লাগলো সে সব কথা। এক সময় কলম নামিয়ে রেখে বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে ভাবতে লাগলাম বন্ধুদের কথা ; ভাবতে লাগলাম অনুভার কথা, অমিয়র কথা···

—'কে ?'

—'আমি অমিয়।'

—'তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে ও কে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে ?'

—'অনুভা।'

—'এত রাত্রে এখানে কেন ?'

—'আমি অনুভাকে বিয়ে করতে চাই।'

—'তোমার সঙ্গে অনুভার বিয়ে হতে পারে না।'

—'কিন্তু আমারই দোষে তো—'

—'না। দোষ অনুভার।'

—'অনুভা তার ভুল বুঝতে পেরেছে। সে এখন অনুতপ্ত। তাকে ক্ষমা করুন।'

—'আমি কিছুই করতে পারি নে।'

—'ঐ দেখুন, সে কেবলই কাঁদছে।'

—'কাঁদবার কাজ করেছে তাই কাঁদ্ছে।'

—'তা হোলে অনুভার কী হবে ?'

—'এ সমাজ তাকে ছাড়তে হবে। সমাজের বাইরে পঙ্কিল আবর্তের মাঝে তাকে কাটাতে হবে ঘৃণ্য জীবন।'

—'তবু মার্জনা নেই ?'

—'উপায় নেই।'

—না, না! এ হ'তে পারে না। একবার ভুল ক'রেছে ব'লে আবার ভুলের পথে ঠেলে দেবেন না। তাকে সুযোগ দিন, বাঁচতে দিন।'

—'আচ্ছা, তাকে কোনো হাঁসপাতালের নার্স করে দেবো।'

—'না, না! তা করবেন না।'

—'তা হোলে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ক'রে দেবো।'

—'সে কি ভালো হবে ?'

—'তবে কী চাও তুমি ?'

—'বলেছি তো, অনুভাকে বিয়ে করতে চাই।'

—'যে পতিতা তাকে তুমি বিয়ে করতে পারো না, অমিয়! সমাজ তোমাকে ঘৃণা করবে।'

—'কিন্তু আমারই জন্যে তো সে আজ লোকের চোখে পতিতা। সে আমায় ভালোবেসেছিলো; কিন্তু আমি তার সে ভালোবাসা উপেক্ষা করেছি। আমি আমার সে ভুলের প্রতিকার করতে চাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন।'

—'আমি তা পারিনে।'

—'আপনি সব পারেন। আপনি কী না পারেন ? আপনি ইচ্ছে করলে অনুভার জীবনে, আমার জীবনে, ফুল ফোটাতে পারেন; আবার আপনিই পারেন তা মরুভূমি করতে।'

—'এ তুমি ভুল বলছো, অমিয় ! তুমি জানো না হয়তো, আমরা যা খুসী তা করতে পারি না। আমাদেরও সমাজকে মানতে হয়, সমাজের মঙ্গল দেখতে হয়।'

—'কিন্তু আমি যে সমাজ চাইনে—চাই মনুষত্ব। আমার বিবেক যা বলছে আমি তাই করতে চাই।'

—'কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন ?'

—'দরকার নেই।'

—'মানসম্ভ্রম ?'

—'চাইনে।'

—'ধনসম্পত্তি ?'

—'থাক্ প'ড়ে।'

—'তবু অনুভাকে ছাড়বে না ?'

—'আপনিই ভেবে দেখুন। আমাদের দু'টি ছন্নছাড়া জীবনকে বহুকষ্টে এক ক'রে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি মিলনের আশায়। আমাদের জীবনকে আর নষ্ট হতে দেবেন না। আমাদের দয়া করুন।... এই নিন কলম, লিখুন—'

* * *

—'এই নিন কলম, লিখুন।' আমার ছোট মেয়ের ডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। আমার হাতে কলম গুঁজে দিয়ে বল্‌লো : লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলে, বাবা ?'

—'আমার আর দু'টি ছেলেমেয়ের সঙ্গে রে পাগলী।' কলমটা হাতে নিয়ে বললাম : 'তারা একটা ভীষণ ভুল ক'রে ক্ষমা চাইতে এসেছিলো। ক্ষমা করবো তাদের ? হ্যাঁ মা ?'

মেয়ে বল্‌লো : 'যখন ভুল বুঝে ক্ষমা চেয়েছে—ক্ষমা করো, বাবা।'

—'বেশ, তাই হোক !'

* * * * *

দু'দিন পরে অমিয়র একখানা চিঠি 'শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানে' নির্মলের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। অমিয় লিখেছে :

ভাই নির্মল,

'শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের' কাজের জন্যে এখন আর আমাদের দু'জনের থাকবার দরকার নেই। জানি, তুই একলাই পারবি সব কাজ দেখাশোনা করতে। তাই আমি গেলাম এই বাঙলারই আর একটি সহরে—ঐ অমনিতর আর একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে। আমার সঙ্গে কে যাচ্ছে বল তো? বৌ। তোর বৌদি। আমার নতুন প্রতিষ্ঠানের মহিলা-বিভাগ খুলবে বলে।

বৌ দেখালাম না ব'লে যেন রাগ করিস্‌নি। আর পরের বৌ না দেখাই ভালো, বুঝলি? তাতে নিজের বৌকে সুন্দরী ব'লেই মনে হয়; কাজেই দাম্পত্য প্রেমে কখনো ভাঁটা পড়ে না।

একটা কাজ করিস, ভাই। আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বলিস : অনুভা অমিয়কে ভালোবাসতো, তাই অমিয় তাকে বিয়ে করেছে। তবে বৌকে ও বাড়ীতে নিয়ে যায়নি, কারণ যে বাড়ীর মর্মান্তিক আচরণে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়, সে বাড়ীতে থাকা অমিয় শুধু লজ্জাকর নয়, বিপজ্জনক ব'লেও মনে করে। আসি ভাই!

তোর অমিয়।

* * *

অমিয় অনুভাকে লুকিয়ে বিয়ে ক'রে কোথায় নিয়ে গেছে জেনে অমিয়র কাকীমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন : 'ছি, ছি! কেলেঙ্কারি!'

—শেষ—

এই লেখকেরই

[illegible]

স্ত্রীভূমিকা ও দৃশ্যপট-বর্জিত ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী একাঙ্ক রসনাটিকা

পদ্মনাভ-রচিত

বিপ্লবের অগ্নিশিখা

বাঙলার বিপ্লবী শহীদদের কাহিনী

—০—

বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনা—**জগদিন্দু বাগচী**

[illegible]

আলেক্জাণ্ডার কুপরিনের সুবিখ্যাত উপন্যাস Yama the Pit-এর অনুবাদ করেছেন

শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীসুকুমার গুপ্ত

চৌদ্দই ডিসেম্বর

দমীত্রি মেরেঝকোবস্কী লিখিত জার-শাসিত রুশিয়ার প্রথম বৈপ্লবিক কাহিনীর উপন্যাস

অনুবাদ করেছেন—**শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ**

[illegible]

অনুবাদ করেছেন—**শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু**

চীনা চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত

রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

দাম আড়াই টাকা